অংশুমান বসু

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন বল
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩



প্রথম প্রকাশ : শুভ মহালয়া ১৩৬৮

মুদ্রাকর :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

যাঁকে কোনোদিন কিছু দিতে পারিনি,
নিয়েছি শুধু দু'হাত ভরে,
আমার স্বর্গগত সেই পিতার উদ্দেশ্যে—

এই লেখকের বই

সূর্য তিয়াষ

## প্রকাশকের নিবেদন

অংশুমান বসু একজন ব্যস্ত সরকারী অফিসার। লেখার অবসর তাঁর খুবই কম। এরই মাঝে অর্থনীতিতে ডক্টরেট অংশুমান ইংরাজীতে লিখেছেন অর্থনীতি ক্ষেত্রে ভারতের নানা সমস্যা নিয়ে অনেক প্রবন্ধ। সেই সঙ্গে তিনি আবার বাংলা সাহিত্যে ফুল ফুটিয়েছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে। সে ভঙ্গী কখনও সংবেদে গভীর, কখনও ব্যথায় ম্লান, আবার কখনও বা নির্মল হাস্যরসে সমুজ্জ্বল।

অংশুমান বসুর চোদ্দটি গল্প নিয়ে বর্তমান সংকলনটি প্রকাশিত হল। উল্লেখ করা বাহুল্য যে প্রতিটি গল্পই আনন্দবাজার, যুগান্তর, বর্তমান, বসুমতী ইত্যাদি নানা পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা আশা করছি বাংলা সাহিত্যের সুরসিক পাঠক-পাঠিকারা 'চতুর্দশী'কে পূর্ণিমার আলোতে গ্রহণ করবেন।

প্রকাশক

॥ সূচী ॥

# সাধুচরণের স্বর্গবাস

বল হরি হরিবোল! বল হরি হরিবোল! মাঝরাতের নিঃস্তব্ধতাকে ছত্রখান করে দূর থেকে একটা উল্লাসভরা চিৎকার ভেসে আসে। সঙ্গে খোল ও খঞ্জনীর আওয়াজ।

সবে ঘুম আসছিল সাধুচরণের। একটা ঘোরের মধ্যে সে লাল নীল পরীদের দেখতে শুরু করেছিল। আর তখনি চট্‌কা ভেঙে উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে। কান পেতে শুনতে থাকে দূরাগত উল্লাসধ্বনি। বল হরি হরিবোল।

নাঃ আর শুয়ে থাকা যায় না। আর একটা আসছে। মুক্তি পাওয়া একটা দেহ শব হয়ে লোকের কাঁধে চেপে এ দিকেই আসছে। লক্ষ্য এক। নিমতলার মহাশ্মশান। আয় আয় বাবা। সংসারের হাজার দুঃখ কষ্টের হাত থেকে বেঁচে যখন গেছিস তখন খোলসটুকু পিছনে ফেলে রেখে আর কী পরমার্থ লাভ হবে! কিছু না। তাকে পুড়িয়ে ছাই হতে দে বাবা। লাফ দিয়ে সাধুচরণ বিছানা থেকে নামে।

শব বহনকারীদের চিৎকার খুব কাছে এসে গেছে। এবার সাধুচরণের আস্তানা ছাড়িয়ে ওরা এগিয়ে যাবে। রাম দুলাল সরকার স্ট্রিট ধরে বিডন স্ট্রিট। সেটাই তো মহাশ্মশানের পথ। মহাপ্রস্থানের পথ! আর দেরি করা যায় না। দড়ি থেকে ময়লা গামছাখানা টেটে নিয়ে সাধুচরণ ঝাঁপ খুলে বাইরে আসে।

বল হরি হরিবোল! মধ্যরাত্রি বিদীর্ণ করা চিৎকারে গলা মেলায় সাধুচরণ। আধ-ছুটন্ত লোক কটার সঙ্গে ছুটতে থাকে সেও। খানিক পরেই দেখা যায় শব বহনকারীদের একজন জায়গা ছেড়ে দিয়েছে সাধুচরণকে। পরমানন্দে শবের খাটে কাঁধ লাগিয়ে সাধুচরণ উন্মত্ত হরিধ্বনিতে মৃতের বৈকুণ্ঠবাস নিশ্চিত করতে থাকে।

রামদুলাল সরকার স্ট্রিট ছাড়িয়ে বিডন স্ট্রিট। রবীন্দ্র কানন পাশে রেখে, চিৎপুর রোডের ট্রাম রাস্তা ছাড়িয়ে সাধুচরণরা এক সময় পেঁছে যায় নিমতলা ঘাট স্ট্রিট। এবার সোজা সেই মহাশ্মশান যেখানে দিনরাত্রির প্রতিটি প্রহরে দাহ হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের দেহ। রোদ নেই, জল নেই, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত নেই, প্রতিদিন মুহুর্মুহুঃ শবযাত্রীর অবিরাম স্রোত এসে পেঁছচ্ছে

সে মহাশ্মশানে। চিতা এখানে বহ্নিমান যুগ যুগান্ত ধরে। মুমুক্ষু মানুষের নশ্বর দেহগুলোকে গ্রাস করে নিচ্ছে হুতাশন। লক্‌লক্‌ করে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে আগুনের শিখা। চিতার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মুক্তির আহ্বান। আকাশকে ডিঙিয়ে পৃথিবীর কান্নাকে পিছনে রেখে মোক্ষলোভী সে ধোঁয়ার ভরে পেঁছে যাচ্ছে অমৃতলোকে।

মহাশ্মশানে পেঁছবার আগেই মুক্তিদাত্রী অভয়া আনন্দময়ী কালীর মন্দির। চার দিকে কাঠের বড় বড় গোলা। মোক্ষেচ্ছু আত্মাকে মুক্তি পাবার আগে আনন্দময়ীর কাছে প্রার্থনা জানাতে হয়। মা, মাগো, নশ্বর এই দেহ ছেড়েছি। এই দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন পৃথিবীর কঠিন নাগপাশ থেকে চিরকালের মতো মুক্তি পাই। ঘোর কৃষ্ণা, লোল জিহ্বা, খড়্গধারিণী জননী শ্মশান কালী বরদা। প্রার্থনা পূর্ণ হবে। যে পঙ্কিল সংসার ছেড়ে এসেছ সেখানে ফেরার বিন্দুমাত্র বাসনা যদি মনে না থাকে তবে তোমার মহামুক্তি। জয় মহাকালী, শ্মশান কালী।

সাধুচরণের দল শবদেহ মা আনন্দময়ীর সামনে নামিয়ে রাখে। প্রার্থনা কর মায়ের কাছে ভালো করে। পাড়ার ছেলেদের ঘাড়ে যেন আর না চড়তে হয়। নিজের ছেলেরা হয়ত এতক্ষণে মন খারাপ নিয়েও ঘুমে অচেতন।

'এগারোটা চা'। কপালের ঘাম মুছতে থাকে দলনেতা।

'এগারোটা নয়, বিষ্টুদা। বারোটা।' সাধুচরণকে দেখিয়ে কেউ একজন বলে। বিষ্টু বারোটা চায়েরই হুকুম দেয়। এই দোকান সারা দিন রাত খোলা। শুধু এটাই নয়। আরো কটা আছে এখানে। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে এরা খাবার দেয়, জল দেয়, চা দেয়, ঠাণ্ডা পানীয়ও দেয়। রোজ দেয়। দিবারাত্র দেয়। শব দাহের পুণ্য কর্মে এদের যোগদানও ষোলো আনা। পুণ্য কামাও বাপ, সঙ্গে পয়সা। এই হল রীতি এখান থেকে মহাশ্মশানের গোটা এলাকা জুড়ে।

ময়লা গামছাটা নেড়ে হাওয়া খেতে থাকে সাধুচরণ। চায়ের গেলাসে চুমুক লাগিয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কটা হ'ল। মনে মনে হিসাব শুরু করে। গত পরশু বৃহস্পতিবারের বার বেলায় একটাকে পুড়িয়ে গেছে। কাল আর পারেনি। শব মিছিল অবশ্য কালও তার ঘরের সামনে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার উঠবার ক্ষমতা ছিল না। সারা গায়ে ব্যথা। জ্বরও ছিল। আজ সে অনেক ভালো। এখন এতটা রাস্তা ভারী মড়া ঘাড়ে নিয়ে প্রায় দৌড়ে এসেও সাধুচরণের মনে হচ্ছে ব্যথা সারা শরীরে কোথাও নেই। জ্বরও বোধহয় ছেড়ে গেছে প্রথম রাতেই। খিদেও পেয়েছিল খুব।

কটা হল মোট! বিড়ি ধরাতে ধরাতে সাধুচরণ হিসাব শুরু করে।

মঙ্গলে ছিল ন'শ' একানব্বই। তারপর বেস্পতিতে একটা। হল গিয়ে ন'শ বিরোনব্বই। আজ একটা। এটা এখনও পোড়েনি। অবশ্য পুড়বেই। নইলে যাবে কোথায়! তাহলে মোট হল গিয়ে ন'শ' তিরোনব্বই। হাজার পুড়তে বাকি কত আর? তিরোনব্বই, চুরোনব্বই, পঁচানব্বই!

সাধুচরণের গোনা বাধা পায়। শ্মশান যাত্রীরা হৈ হৈ করে উঠে পড়ে। এখনও খানিক পথ। অবশ্য খুব সামান্যই। পঁচানব্বই, ছিয়ানব্বই, সাতানব্বই। কর গুনতে শুরু করে সে। আটানব্বই, নিরোনব্বই, শ'! মানে শ' পুরতে আরো সাতটা লাগবে। শ' হওয়া মানেই হল হাজার পোরা। তারপর আর মাত্র একটা হলেই হাজার একটা মড়া পোড়ানোর কাজ পূর্ণ হবে। তারপর! তারপরই তার পালা। মহাপ্রস্থানের পথে শেষ যাত্রা। আর ফেরা নেই সে যাত্রায়। মা আনন্দময়ীর কৃপায় অক্ষয় সগ্গবাস তার আটকায় কে! বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীরা যা পারে না, মুর্খ, গরিব সাধুচরণ সেই অসাধ্যই সাধন করবে। সগ্গে গেলেই সবার সঙ্গে তার দেখা হবে। তার বাবা! মা! আর বৌ! আহা, বড্ড অভিমান ভরে বৌটা গেছে গো! তাকে কাছে টেনে সাধুচরণ অভিমান ভাঙাবে।

কিন্তুক সগ্গে যাওয়া কি এতই সহজ! সাধুচরণের মনে পড়ে, তার গুরু বারবার বলেছিল তোমার সজ্ঞানে সগ্গলাভ কে আটকায় বাপু! কিন্তুক কাজটা কঠিন বড়। এর তরে অন্তত হাজার একটা মড়া পোড়ানোর কাজে কাঁধ দিতে হবেক। শুধু কাঁধ দিলেই চলবেনি, দাহতক শ্মশানে থাকা চাই। আর শ্মশান-বন্ধুর কৃত্য করে কোনো রোজগার করা চলবেনি। এমনকি ভোজেও যাওয়া চলবেনি। সব সাধ ত্যাগ করি দাহ কাজে অংশ নিতে হবে।

সাধুচরণ তখুনি ঠিক না বুঝলেও কিছুদিনেই বুঝে যায় কাজটা সত্যিই কঠিন। একটা দুটো লয়, হাজার একটা মড়া পোড়ানো! কঠিন আরো, পেটে দানা নাই। অবিশ্যি একবার পুড়ালে অক্ষয় সগ্গবাস। আর পুনর্জন্ম নাই। এই পৃথিবীর ধুলো কাদাতে আর ফিরাফিরি নাই। তার মানে রাজেনবাবুর দাওয়ায় বসি বিড়ি বাঁধা নাই, পেটে খিদে লিয়ে মড়া পোড়ানো নাই, ভদ্দরলোকদের বৌ-বাদের দেখি মনটা আনচান করা নাই। সে কি চাট্টিখানি ব্যাপার নাকি!

দলের সঙ্গে সাধুচরণও চলা শুরু করে। বাঁ দিকের ঘাড়টা টনটন করে বড়ো। সাধু কাঁধ পাল্টায়। একবার মনে হল মৃতের পরিচয় জেনে নেয়। কিন্তু কি হবে জেনে! যারা দলে আছে তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউ মৃতের আত্মীয়-বন্ধু নয়—এটুকু সে বুঝে গেছে। খোল-খঞ্জনীওয়ালা ভাড়া করা। বাকিরা পাড়ার ছেলে। বেশির ভাগই রকে বসে গুলতানি মারে। শেষ সময়ে এই ছেলেগুলোই সবচেয়ে বড়ো বন্ধু।

চক্ররেলের লাইন ছাড়ায় ওরা। এর পরই মহাশ্মশান। এখান থেকেই সেখানকার চুল্লির আগুন দেখা যাচ্ছে। দাউ দাউ করে লেলিহান শিখা অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে সর্ব পরিব্যাপ্ত হতে চাইছে। সাধুচরণ জানে সেও একদিন এই আগুনে আহুতি হবে। আর সে দিনই তার অভিশাপ মুক্তি।

নিমতলা মহাশ্মশানে শব পেঁছিয়। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অনন্ত জীবন প্রবাহ গঙ্গার খাতে। চারিদিকে লোকজন। তবু একটা অশরীরী নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে উঁচু নিচু স্বরে কথাবার্তা। হাসি ঠাট্টাও। কোথাও ক্রন্দন ধ্বনি। এ পাশে ও পাশে চুল্লির আগুন। এক চিতার আগুন স্তিমিত হবার আগেই সাজানো নতুন চিতা জ্বলে উঠছে। আধো অন্ধকারে মাঝে মাঝে ফট্‌ফট্‌ শব্দ আসছে—খুলি ফাটার আওয়াজ। কখনও বা দেহের মোটা হাড় ফাটার শব্দ। সঙ্গে উঠছে হরিধ্বনি। হরিবোল! জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কেউ বিবশ উতলা, কেউ অভিভূত, কেউ আবার এরই মধ্যে দরদাম করছে, লাভের অঙ্ক বুঝে নিচ্ছে পুরোপুরি।

সাধুচরণের দল মৃতদেহ নামিয়ে রাখে। বৃদ্ধ ঘাটবাবু জাবেদা খাতা খুলে বসে আছে। একটানা একঘেয়ে সুরে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে মৃতের নাম, পিতা বা স্বামীর নাম, ঠিকানা, পেশা, বয়স, স্ত্রী না পুরুষ, মৃত্যুর কারণ। পাকা বাঁধানো খাতায় উঠে যাচ্ছে সে বিবরণ। সাধুচরণের মনে হয় যেন স্বয়ং চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে বসে আছেন। দিনক্ষণ মিলিয়ে তুলে নেবার ব্যবস্থা করছেন। আচ্ছা, ঐ জাবেদা খাতায় ঘাটবাবুর নিজের নাম উঠবে কবে! সে নাম ঠিকানা কি লিখবে! নতুন কোনো ঘাটবাবু! আর সাধুচরণের নাম! সেই বা কবে ওঠে কে জানে! তবে অনেক বাকি নেই আর। এই তো হল গিয়ে ল'শ' তিরোনব্বই। আর মাত্র আটটা! এরই মধ্যে যদি শহরে দাঙ্গা লাগে, নয়ত মড়ক তবে দু' হপ্তার ব্যাপার। নইলে চার ছ' হপ্তাও যাবে না।

শ্মশানের বাইরে আসে সাধুচরণ। ওদের চিতা সাজানো হচ্ছে। বেশি সময় যাবে না। তারপর চিতায় মড়া চাপিয়ে আগুন দেওয়া। সে কাজ সাধুচরণ করবে না। ঐ আত্মীয় ভদ্রলোক, ভাই না ভাইপো কী যেন হয়, ওই সে কাজ করবে।

শ্মশানের পাশেই কালভৈরবের মন্দির। মহাদেব মহাকাল হয়ে এখানে নিত্য জাগ্রত। মন্দিরের ভিতরে ছোট ছোট দল। জয় বাবা কালভৈরব। জয় বাবা ভোলেনাথ! মদ উড়ছে! গাঁজা পুড়ছে। ভক্তেরা ভক্তি-নেশায় টলোমলো। ঢুলুঢুলু চোখের সামনে কাল ভৈরবের পাশে মহাকালীর ব্রেক ডান্স। কালী! কালী! কলকাত্তাওয়ালী! লাচ মা, দুলি দুলি লাচ। খাঁড়াখানারে তুলি রাখে হাতের মুদ্রায় লেশাটা জমাট করে দে মা!

সাধুচরণ এখানে চেনা লোক। বহুবার এসেছে। এলেই বাবার প্রসাদ পায়। ওকে দেখে ওর দোস্ত মহাবীর বাংলা বোতল বাড়িয়ে দেয়। 'লে সাধু, মেরে দোস্ত, মেরে বেটা, ভক্তিরস লে।'

সাধু নেয় না। কারণবারিতে তার রুচি নেই। মায়ের পেসাদে খালি পেটটা টনটন করি ওঠে। কেমন একটা ব্যথা হয় শালা। এর চেয়ি বাবার পেসাদ ভালো। এক টানি কল্কি ফাটাও। দম বন্ধ করি বসি থাকো। তারপর ক'বার দম মারো দম। চোখির সামনে চিতের নীল ধুয়া সগ্গের অপ্সরীর গলার নীল পাথুরির মালা হয়ি যাবে। মদো গেঁজেল লোক-গুলোন পর্যন্ত মুহূর্তি রঙ পাল্টি শালা না দেখা স্বপ্নপুরীর দেবদেবীর মতো সোন্দর হয়ি যাবে।

হাত বাড়িয়ে কল্কে নেয় সাধু। দু হাতের মধ্যে ধরে মাঝারি টান দেয় কটা। না, ভালো লাগতিছে না। মাথাডা কেমন বোঁ করি উঠল। খালি পেটে মাল টানা, গাঁজা টানা পোষায় না। কল্কে ফিরিয়ে দেয় সাধু।

উঠতে গিয়েও সাধুচরণ উঠতে পারে না। ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে সামনেটা। ওরই মাঝখানে একটা মুখ শুধু উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কমলা-বালার। সাধুচরণের বিয়ে করা বৌ।

সে কতকাল হল, সাধুচরণ ভাবে। কত দেন (দিন) হল কমলাবালা তাকে ছোড়ি গেছে। তারি কাঁধে চড়ি, কপালে চওড়া করি লাল সেঁদুর ঢেলি, দু চরণে আলতা পরি, লতুন কাপড় পরি কমলাবালা চলি গেছে। আর ফিরে আসেনি, আসবেনি কখনও। মুখে আগুন সেই দিইছিল। আর সেই শুরু। সাধুচরণের মড়া পোড়ানো শুরু। কমলাবালা তার পয়লা লম্বর। জীবনে মরণে এক লম্বরই থাকল সে। ছ' মাসের মাথায় দু' লম্বর তার বাপ। দেড় বছর বাদে মা। এরপর সাধুচরণের নম্বর সমানে বেড়ে গেছে যখন গাঁয়ে ওলাওঠা লাগল। আর তারি কিছু পরে গুরু পেল সে। গুরু দিল অক্ষয় স্বর্গের আশ্বাস। সাধুচরণ তখন থেকে খালি এগিয়েই চলেছে। পেছনে ফেরার আর কিছু নেই তার। মা গেছে, বাপ গেছে, বৌ গেছে। আর কেউ নেই। ঘটি বাটি যা ছিল দিল বেচে। সামান্য কটা টাকা সম্বল করে ডেরা বাঁধল কলকাতা শহরে, রাজেনবাবুর ভাঙা বারান্দায়। একেবারে মহাপ্রস্থানের পথের ধারে।

কমলাবালার কথা মনে পড়তেই সাধুচরণের মগজটা খালি খালি লাগে। ওর মুখখানা বড় অস্পষ্ট লাগছে। এঃ পিতিমের ফটোতে বড্ড ময়লা জমিছে যে গো। এট্টু সাফ করো ছবিটারে। দাও টান। জোর টান ছিলিমে। গাঁজার টানে ময়লা সাফ, ছবি সাফ। কমলাবালা বিয়ের রাতের কচি বউটি। এই কচি বউডারে চড় মেরিছিল সাধুচরণ। বড্ড জোরে মেরিছিল গো সেদিন। সিনিমা দেখতি চেইছিল সে। শাড়ি চেইছিল

লতুন লতুন। রুপোর নাকছাবি আর মলের জন্য জিদাজিদি ধরেছিল কদিনই। গাঁ ছোড়ি শহরি থাকাতি চেইছিল।

'এঃ বড্ড শখ শাড়ি জামার! সিনিমা দেখার! গেরস্থ ঘরের বৌ, মনে লত করি ঘর সংসারের কাজ করি যাবা কুথায়, না শহরে যাবো। সেথায় থাকব। ওরে আমার বাবুর বাড়ির কইন্যে।' খুব রেগে গিয়েছিল সাধুচরণ।

'শহরে যাবো নাকি তুমাদের হাভাতের ঘরে ঠ্যাঙা লাথি খেয়ে মরবো! বেশ করব যাবো! শাড়ি জামা আমার চাই-ই, গয়না চাই লতুন। না দিবে তো বিয়া করিছিলে কেনে?'

'বাপের ঘর থিঙ্গে কোন রাজার ধন এনেছিস শুনি যে এতবড় তোর চোপা! এক থাপ্পড়ে চোপাখানি ভাঙি দিব।' সাধুচরণের চোখে তখন আগুন।

'থাপ্পড় দিলিই হল! মারো দেখি কেমন পারো। আমিও থানায় যাবো। বড় দারোগাবাবুর কাছে নালিশ করব তুমার নামে। তুমায় জেলে দিব।'

আর নিজেকে সংযত রাখেনি সাধুচরণ। মেয়েছেলের এত বাড়। এত বাড় ভালো লয় গো। তাই কষে থাপ্পড় মেরেছিল কমলাবালার গালে। থাপ্পড়ের জোর বোধহয় একটু বেশিই ছিল আর সেটা পড়েছিল কান ঘেঁসে। 'মাগো' বলে তারপরই কমলাবালা লুটিয়ে পড়ে।

কিন্তু সেই শেষ নয়। জল বাতাসে সে উঠে বসলেও গুম মেরেছিল। তারপর মাঝরাতে কখন উঠেছে, দরজা খুলে বাইরে এসেছে, তুলসীতলায় গলায় আঁচল জড়িয়ে শেষ প্রণাম করেছে। হয়ত সাধুচরণের উদ্দেশ্যেও প্রণাম জানিয়েছে। তারপর কখন সে চৌধুরীদের অতল দিঘির জলে তলিয়ে গেল তা কেউ জানে না।

নাঃ, নেশাটা আজ জমে না কিছুতেই। দে বাবা আর এক ছিলিম।' জয় ভোলেনাথ! জয় কাল ভৈরব। চোখে ঘোর লাগা মা। চারধারে মড়ক লাগা মা। আসুক। হুড়হুড় করি মড়া আসুক। সার দিয়ে আসুক মহাশ্মশানে। সে কাঁধ দিবে। যত পারে কাঁধ দিবে। জয় মা কালী, জল্দি জল্দি হাজার পোরা মা। আজ কত বছর ধরি সে শ্মশান-বন্ধুর কাজ করতিছে। আর যে পারি না মা! হাজার এক পুরায়ে অধমকে মুক্তি দে মা! কমলাবালা তাকে ফাঁকি দিয়েছে। কাঁদায়েছে অনেক। সেও কাঁদাবে ওকে। অক্ষয় স্বর্গে বসি থাকি তাকে কাঁদাবে চোয়াড়ে একটা লোকের ঘরে পাঠি দিয়ে।

মাথাটা এত ঘোরে কেন! জ্বর ছেল বলে! কিন্তু জ্বর তো বেশি হয়নি। তবে! পেটে কদিন দানাপানি বিশেষ পড়েনি সিটাই কি কারণ!

পড়্‌বিই বা কী করি ! বিড়ি বাঁধাটা কম হয়িছে খুব বেশ কিছুদিন ! গোটা ভাদ্দরই তো মড়া এসিছে স্রোতের মতো। আশ্বিনে কটা দিন ভাটার টান। তারপর শীত শুরু হতি না হতিই শুকনো পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো-গুলোও খসি পড়তিছে টুপ্‌টাপ্। ভালোই বটে ! সেই বোশেখের গোড়ায় মড়া পোড়ানো হইছিল লশ'র কিছু বেশি। তারপর এই ক' মাসে হাজার ছুঁই ছুঁই। বিড়িটা সে বাঁধে কখন ! আর বিঁড়ি না বাঁধলি তার খোরাকটা আসে কুথা থেকে !

আজ একটু মাল টানবে নাকি সাধুচরণ ! ঘুরি ফিরি কমলাবালা আসতিছে সামনে। কখনও হাসি খুশি উজ্জ্বলা কিশোরী, কখনও ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতো ফণা দোলানো ভয়ঙ্করী।

আর একটা মুখ মনে পড়ে সাধুচরণের। এটাও একটা মেয়ের মুখ। শেষ রাতে ফোটা এক রাশ জুঁইয়ের মতো। এত সুন্দর আর পবিত্র মুখ সাধুচরণ আর দেখেনি। কিন্তু এ মুখে হাসি ছিল না, জীবনের রঙ ছিল না। ছিল দীর্ঘ রোগ ভোগের যন্ত্রণার ছাপ আর চিরকালের মতো রোগমুক্তির প্রসন্নতা। জুঁই-এর গোড়েমালার মতোই মেয়েটি শেষ শয্যায় শুয়ে তারই কাঁধে চেপে এখানে এসেছিল। মৃত্যুতেও সুন্দর সেই অপরূপা অনাত্মীয়া চিরকালের মতো সাধুচরণকে বেঁধে রেখেছে।

'চলুন এবার। কাজ হয়ে গেছে।' সহযাত্রী একটি ছেলে সাধুচরণকে ডাকে।

লাল লাল চোখ মেলে চায় সাধুচরণ। 'এঃ বড্ড বেলা হয়ে গেল যে ! গঙ্গা চান করি এখুনি ফিরতি হয় তো।' সাধু উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু মাথাটা টলমল করে কেন এত ! দুর্বলতা ! দূর শালা, পেটের মধ্যি সারা রাত চিতে জ্বলিছে। জ্বলি জ্বলি সেটার আগুন এতক্ষনি নিভি গেছে ! দুর্বলতা তো সিখানেই।

সামনেই ঘাট। সাধুচরণ জলে নামে। এত ঠান্ডা কেন জল ! ভীষণ শীত করে তার। জ্বর আবার বাড়ে নাকি ! তা হবি। বাড়ুক জ্বর। গঙ্গা চানে ও আপনি কুমি যাবে। মড়া পোড়ানোর পর গঙ্গা চান না করি চলে না যে !

দলের লোকেরা সাধুচরণকে ডাকে। 'আসুন, দাদা, চা জলখাবার খেতে আসুন।'

'না, আমি যাই। আমার মেলা কাজ আছে।' সাধু দাঁড়ায় না। ওদের অনুরোধ-উপরোধ পাশ কাটিয়ে ফেরার পথ ধরে। ঘরে যে ক' বাণ্ডিল বিঁড়ি আছে তা চৈতনরে দিয়ে মজুরির পয়সাটা আজই নিতে হবে। দেরি করা যাবে না। আর মাত্র আটটা মড়া। তারপর এই পৃথিবীর সঙ্গে সব লেনদেনের পালা শেষ। তাই চৈতনের সঙ্গে ফয়সালা আজই দরকার।

রঘুবাবুর কাপড়ের দোকানে সে পুজোর সময় কদিন খুব খেটেছিল। সে পয়সাটাও বাকি। রঘুবাবুকে বলবে পাওনা মিটিয়ে দাও। সব দেনাপাওনা শেষ করি দিতি হবে আর কদিনেই। তারপর তার সগ্গবাসের পালা। হাজার একটা মড়া পোড়ালিই। এ গুরুবাক্যি। তার গুরু। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ। হিমালয়ে পাক্কা সাতাশ বছর তপস্যা করা গুরু। তেনার কথা মিছে হবেনি। তাই তো সাধুচরণ আজ এত বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে শব দাহকারীর ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বল হরি হরিবোল! নতুন মড়া আসে নতুন একদলের ঘাড়ে চেপে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে সাধুচরণ ভাবে সে মরলে তার মড়া কে ঘাড়ে তুলবে! সংসারে তো তার কেউ নেই। মুখে আগুনই বা দেবে কে! কেউ নেই। না, না, আছে। চৈতনের ছেলেটা ভারী ভালো। ওর খুব ন্যাওটা। ওকে ভালোবাসে খুব। হ্যাঁ, সেই আগুন দেবে সাধুচরণের মুখে!

মৃত্যুর কথা কেন মনে আসে আজ এত! গুরু তাকে বলেছে অন্তত হাজার একটা মড়া পোড়ানোয় ভাগ নিতে। গুরু তো বলেনি হাজার এক পুরলেই সে মারা যাবেক। শুধু বলিছে হাজার একটা মড়া পুড়োবে যে তার অক্ষয় সগ্গবাস বাঁধা। তামা হাতে গুরু যে বাক্য বলিছে তা মিথ্যে হবেনি কোনোদিন। তাই সাধু সগ্গে যাবে নিঘ্‌ঘাত। কিন্তু কবে সে জানে না।

মাথাডা বড্ড ঘুরতিছে যে গো। হাঁটা যেন আর যায় না। পা দুটো খালি থামি থামি যায়। বড্ড ভারী ও দুটো। পড়ি যাবে নাকি সে! জয় মা আনন্দময়ী! ভিজে কাপড়ে বড্ড শীত নাগে যে গো। ঠাণ্ডাটা বড়ো বেশি যেন। এট্টু রোদে শুলি যেন ভালো হয়। না, চল। হিসাব মিটানোর সময় এখন। নিজের ডেরার দিকে টলতে টলতে সাধুচরণ এগোতে থাকে। টলতে টলতে চলতে চলতে ওর মনে হয় আর কত দূর! কত দূরে আরো যেতি হবে!

কোনো মতে যখন নিজের ডেরায় ঢুকে ঘরের ঝাঁপটা সাধুচরণ টেনে দিল তখন তার মাথাটা অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। শরীরটা অবশ। পা দুটো তার ভার আর বইতে পারছে না।

পরের দিন নিয়মিত হরিবোল ধ্বনি দিতে দিতে নিমতলার পথে শবযাত্রা গেল কয়েকবার। সাধু উঠল না। তারও পরের দিন শবযাত্রার সংখ্যা প্রায় এক থাকলেও তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে সে সংখ্যা কিছু বেড়ে গেল। কিন্তু সাধুচরণ তার ঘরের ভাঙা ঝাঁপ সরিয়ে বাইরে এল না। চৈতনের কাছেও সে গেল না বাঁধা বিড়ির বাণ্ডিলগুলো নিয়ে। রঘুবাবুর কাছেও সে তার পাওনার টাকা চাইতে গেল না। কী হল সাধুচরণের!

ছ' দিনের দিন রাজেনবাবুর বাড়ীর লোকেরা পাড়ার ছেলেদের ডাকল।

বারান্দার কোণে দরমা ঘেরা সাধুচরণের ঘর থেকে উৎকট গন্ধ বেরোচ্ছে। সাধুচরণেরও দেখা নেই বেশ ক'দিন। ছেলের দল এগিয়ে যায়। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলতেই বীভৎস দৃশ্য। মেঝের উপর সাধুচরণ পড়ে আছে কাঠ হয়ে। গায়ের উপর পিঁপড়ের সার। ঘরে মানুষ পচা দুর্গন্ধে দাঁড়ানো দায়।

পুলিশ এল। সাধুচরণের পচাগলা শরীরটা ভ্যানে চেপে হাসপাতাল হয়ে মর্গে গেল। সেখানে কাটাছেঁড়ার পর বেওয়ারিশ লাশের গাদায়। তারও পরে বেওয়ারিশ গাদার সঙ্গে লাদাই হয়ে চিতায়। সেখানে হরিধ্বনি উঠল না। কেউ এল না ওর মুখে আগুন দিতে। দু ফোঁটা চোখের জল ফেলল না কেউ। শুধু সাধুচরণের জিগরি দোস্ত কাল ভৈরবের সেবক মহাবীর হঠাৎ কী ভেবে সেদিন লাল পানি ফেলে কল্কেতে দম দিল। বুক ভরা ধোঁয়া টেনে আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে সে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। নীল ধূসর ধোঁয়া যখন তার মগজটাকে বেশ গুলিয়ে দিয়েছে তখন তার মনে হল নীল ধোঁয়ার রথে সাধুচরণ অক্ষয় স্বর্গের রাস্তা ছেড়ে অন্য দিকে, অন্য কোনোখানে চলে যাচ্ছে। আর সাধুচরণ সে ধোঁয়ার রথে বসে গুনে যাচ্ছে ন'শ' একানব্বই, ন'শ' বিরানব্বই, তিরানব্বই...। তিরানব্বই-এ যেন সাধুর গোনা আটকে থাকে।

## অরণ্য আদিম

শীতের রোদের মিঠে আমেজে পিঠ পেতে টোটোপাড়া হাই তুলতে তুলতে থমকে দাঁড়াল। ভুটানের পাহাড়গুলো সার বেঁধে ঝলমল করছে। পিঠে সন্তরার ( কমলালেবু ) বোঝা নিয়ে মুটিয়ারা উপর থেকে নীচে নেমে আসছে। টোটোপাড়ার কটা লোক আর কত লেবু খাবে! সব চলে যাবে হান্টাপাড়া মাদারীহাট হয়ে ধুপগুড়ি অথবা হান্টাপাড়া হয়ে বীরপাড়া। ওখান থেকে ট্রাক বোঝাই হয়ে শিলিগুড়ি। তারপর শিলিগুড়ি থেকে চালান হবে ট্রেনে এবং ট্রাকে কলকাতায়, দিল্লীতে, ভারতের নানা ছোট বড় শহরে বন্দরে।

আঘাই এর ( অগ্রহায়ণের ) রোদ ওঠা আলো ছড়ানো দিনে টোটোদের ছোট্ট গ্রামখানায় কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছে। সন্তরার কেনা বেচা এর কারণ নয়। টোটোদের নিভৃত জীবনে এ আর কতটুকু আলোড়ন জাগায়। আজ আইতোয়া টোটোর লংগংএ ( প্রাঙ্গণে ) ইস্‌পার পুজোর আয়োজন। আইতোয়ার একমাত্র ছেলে ওমেপা টোটো দু-চার দিনের মধ্যেই ঘরে ফিরে আসছে। তারই কল্যাণ কামনায় লংগংএ পুজোর ব্যবস্থা। ইস্‌পাকে সন্তুষ্ট করা দরকার। তাঁর করুণা হলে সর্বপ্রকার ভয় ভীতি, রোগ ব্যাধি বা অন্য বিপদাশঙ্কা কেটে যাবে। ওমেপা নিরাপদে ঘরে ফিরে এসে বাপ মায়ের কোল জুড়োবে।

সকাল থেকে মিঙ্‌মারও সময় নেই। মিঙ্‌মা হর্না টোটোর যুবতী মেয়ে। বয়স ষোলো পেরিয়ে সতেরয় চলে গেছে। টোটোদের মধ্যে এত বড় মেয়ে থাকে না। এরও থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই যে আত্মীয়তা বিচার করে তিন বছর আগে আইতোয়া মিঙ্‌মার বাবাকে যা বলেছিল তারই সূত্র ধরে ওদের বিয়ে ঠিক। কিন্তু ওমেপা এতদিন বাইরে থাকায় শুভকাজ সমাধা হতে পারেনি। এবার সে ঘরে ফিরে আসছে। সঙ্গে নিশ্চয়ই রোজগারের টাকাও থাকছে কিছু। তার ওপর চিমার ( গ্রামদেবী ) কৃপায় কাওনী আর মারুয়া ভালোই হয়েছে। এবার অভাব নেই কিছুরই বলতে গেলে। শুয়োরগুলোরও সংখ্যা বেড়েছে। আইতোয়া আবার মুরগী ছাগলও পোষে। কাজেই ওমেপার বিয়ে বেশ হৈ-চৈ করে দেবার ইচ্ছাই তার।

আইতোয়ার বাড়ির সামনে অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। মিঙ্‌মা অনেকখানি গোবরগোলা জল নিয়ে সেটাকে বেশ যত্ন করে মার্জনা করছিল। টোটোরা আগে এসব করত না। ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে মাদারীহাটের আশেপাশের গ্রামগুলোতে রংপুর জেলার লোক এসেছে অনেক। তাদের কাছ থেকেই মিঙ্‌মা গোবর জলে উঠোন পরিষ্কার করা শিখেছে। ওর মনটা আজ কোথায় যাচ্ছে ও নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। ওদিকে ভুটানের পাহাড় পেরিয়ে আরো উত্তরে মন যেতে চায়। না, মন পড়ে আছে মাদারীহাটের রাস্তায়। আরো দূরে জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি। হ্যাঁ, ওদিক থেকেই ওমেপা আসছে। অনেক কেতাব পড়া শিখেছে নাকি। আরো শিখেছে কি এক বেয়াড়া জানোয়ারকে চালাতে। খুব জোরে দৌড়তে পারে জানোয়ারটা। আইতোয়ার ঘোড়ার থেকেও অনেক বেশি জোরে। ওমেপা টোটো সেই জানোয়ার চালাতে শিখেছে। ও কত বড় পণ্ডিত। টোটোপাড়ার সেরা ছেলে। সে-ই নাকি তার স্বামী হবে। গর্বে মিঙ্‌মার বুক ভরে যায়। আরক্ত হাসি ওর চ্যাপ্টা মুখখানাকে যেন রাঙিয়ে দেয়। ও তাকায় তোর্ষা নদীর ওপারে বাদু পাহাড়ের দিকে। ওখানেই ইস্‌পা থাকেন। তাঁরই পুজোর আয়োজন এখানে। মনে মনে মিঙ্‌মা ইস্‌পাকে প্রণাম জানায়। সব ভালো রেখ, সব মঙ্গল কর ইস্‌পা। ওমেপা যেন ভালো মত তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

সূর্য যখন মাথার উপরে উঠে এল তখন ইস্‌পার পুজো শুরু হল। পরিষ্কার প্রাঙ্গণে কলাপাতা বিছিয়ে তার উপর শুকরের তিতি (রক্ত) ছড়িয়ে দেওয়া হল। জ্যান্ত শুয়োর মেরেছে আইতোয়া আজ। ইস্‌পার পুজোয় শুকরের রক্ত না দিলে চলে না। চিমা দেবী মুরগি পেলেই খুশি। কিন্তু ইস্‌পার পুজোয় শুয়োর চাই-ই। বিশেষ সন্তরার সময়। সার সার মাটির পাত্র ভরে রাখা আছে ইউ (স্থানীয় মদ)। দেবতার নৈবেদ্য এই ইউ অত্যন্ত মঙ্গলের। দেবতা খুশি হলে তার প্রসাদী ইউ পান করে সকলে সর্ব অমঙ্গলের হাত থেকে মুক্তি পাবে। আর আছে আলোচাল। লড়ুয়ে মুরগিও এক কোণে বাঁধা আছে একটা। ইস্‌পার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

বেলা গড়িয়ে যায়। আধাই-এর সূর্য তাড়াতাড়ি ছুটি নিতে চায়। মিঙ্‌মা টলোমলো পায়ে এগোয় তোর্ষা নদীর দিকে। তোর্ষা পেরিয়ে সে এগিয়ে যাবে ফুন্টশিলিঙের পথে। বাদু পাহাড়ের নীচে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবে ইস্‌পাকে খুশি করার জন্য, ঠিক যেমন করে রাজবংশীরা মাটিতে উপুড় হয়ে বুক টেনে টেনে প্রণাম করে বিষহরির পুজোর সময়, কিংবা দুর্গা বা কালী পুজোর সময়। ইস্‌পা খুশি হলে তার সব হবে। ইস্‌পা রাগ করলে তার চতুর্দিকে সর্বনাশের আগুন জ্বলে উঠবে।

তোর্ষার শুকনো বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে মিঙ্‌মা আরো এগোয়।

ইউ বোধহয় বেশি পেটে পড়েছে। পা টলছে তার। মাথা ঘুরছে। চোখ দুটো কেমন ভারী ভারী হয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টি ঘোলাটে। হে ইস্‌পা, তুমি দয়া কর, আমি আর এগোতে পারছি না। আমি এখান থেকেই তোমায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। বালির উপর মিঙ্‌মা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মিঙ্‌মা স্বপ্ন দেখছিল। আইতোয়া টোটোর যোয়ান ছেলে ওমেপা টোটো যন্ত্র জানোয়ার থেকে নেমে এল। সবল দুহাত বাড়িয়ে মিঙ্‌মাকে তোর্ষার বালি থেকে বুকে তুলে নিল। তারপর আলগোছে ওর শক্ত ঠোঁটদুটো দিয়ে কপাল ছুঁল একবার। এবার, এবার কি করবে মিঙ্‌মা! ওমেপা ওকে সযত্নে যন্ত্র জানোয়ারটির উপর বসিয়ে দিল। তারপর কি একটা কল নাড়তেই দানোটা গোঁ গোঁ করে উঠল। ভয়ে মিঙ্‌মা ওমেপার হাত দুটো চেপে ধরল।

ঘুম ভেঙে গেল মিঙমার। এ কে! কে তুমি?

আমি। আমি শেবতাঞ্জি।

তুমি! তুমি এখানে কেন? মিঙমা সংবিত ফিরে পায়। নিজেকে জোর করে শেবতাঞ্জির বন্ধন থেকে মুক্ত করে।

তোকে নিয়ে যেতে। তুই বালির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলি।

মিঙমার সারা শরীর জ্বলে ওঠে। সে শেবতাঞ্জিকে একদম দেখতে পারে না, যদিও সে ওর ভগ্নীপতি। ওর দিদি ছ মাসও হয়নি মারা গেছে। সেই থেকে মিঙমার পিছনে লেগে আছে ওকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু টোটোদের সামাজিক ব্যবস্থায় স্ত্রী বা স্বামীর মৃত্যু হলে স্বামী বা স্ত্রী আবার বিয়ে করতে পারলেও এক বছর অন্তত তাকে একলা থাকতে হয়। কিন্তু এটুকু দেরিও শেবতাঞ্জির যেন সইছে না।

পেকা দাম্বেটা (ষাঁড়টা) ওর মধুর স্বপ্নটা ভেঙে দিল। মিঙমা বিরক্ত হয়।

মিঙমা! গম্ভীর স্বর শেবতাঞ্জির।

বল, কি বলছ!

তুই ওমেপাকে ছাড়। এতদিন গাঁ ছাড়া হয়ে ও শহরের ছেলে হয়ে গেছে। টোটো গাঁয়ের মেয়ে তোকে আর চোখেও দেখবে না।

মিঙমার সারা শরীর আবার জ্বলে ওঠে। লোভী কুত্তা। ওকে ভোলাতে এসেছে। বরফ শীতল দৃষ্টি মেলে মিঙমা শেবতাঞ্জিকে দেখে একবার। আঘাই এর ঠাণ্ডায় একটু একটু শীত হয়তো করছিল! তবু হ্যাংলা কুত্তাটার লোভী চোখের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্য সে ছোট শাড়িটার আঁচল ভাল করে টেনে নিজের গায়ে জড়িয়ে নেয়। বাদু পাহাড়ের মাথার উপর চাঁদ উঠছিল আস্তে আস্তে। পূর্ণিমার আর দেরি নেই। হাল্কা জ্যোৎস্নায় মিঙমা শেবতাঞ্জিকে ভালো করে দেখে একবার। একটু ছলনা করে।

ও তো দু-চারদিনের ভিতরেই আসছে। শহরের হাওয়া গায়ে লেগে আমায় আর পছন্দ যদি না করে তবে ক্ষতি কি? তুমি তো আছই। মুচকি আসে মিঙমা। শেবতাঞ্জি আরো এগোবার চেষ্টা করবার আগেই সে হনা টোটোর ঘরের দিকে চলতে থাকে।

ওমেপা টোটো আসতে আসতে আঘাই পেরিয়ে গেল। পুই মাসের (পৌষ মাসের) জুকুংবারে (মঙ্গলবারে) সূর্য যখন ভূটান পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে তখন সন্তরার গাড়িতে ওমেপা টোটো গাঁয়ে এসে উপস্থিত হল।

আইতোয়া বাড়িতেই ছিল। খবর পেয়েই ছুটল সন্তরা হাতিতে (হাটে)। মস্তবড় ডিজেল ট্রাকে চেপে ওমেপা গাঁয়ে আসতেই চারদিকে হৈ-চৈ সুরু হল। কেমন দেখতে হয়েছে ওকে! চেহারাটা বড্ড জমকালো মনে হচ্ছে। চুলেরই বা বাহার কত। বীরপাড়ার উঠ্‌তি ছোকরাদের মত সে রঙীন পোশাক পরেছে। চোখে কালো চশমা। ডান হাতের কবজিতে রুপোর ঘড়ি বাঁধা।

আইতোয়ার বৌ একবার ওমেপাকে আর একবার সবাইকে তাকিয়ে দেখল। আনন্দে গর্বে তার দুচোখে জল। তার ওমেপা টোটো গাঁয়ের সেরা ছেলে। কেমন রাজপুত্রের মত এসেছে তোমরা সবাই দেখ। আইতোয়া এগিয়ে গিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ওমেপা তাকায় বাপের দিকে। এই লোকটা তার বাপ নাকি! এই প্রায় উলঙ্গ লোকটা তার জন্মদাতা! ওর নাকটা একটু কুঁচকে যায়।

শুক্লা দশমীর চাঁদ বাদু পাহাড়ের মাথার উপর অনেকটা উঠে এসেছে। সাধারণ নিয়মে টোটো পাড়ার এখন ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু আজ কারো চোখে ঘুম নেই। সবাই এসে জুটেছে আইতোয়ার দাওয়ায়। অনেকের সঙ্গে, কিন্তু অনেকের পিছনে মিঙমাও দেখছে ওমেপাকে। ঐ ওমেপা, তার কল্পনার রাজপুত্র, তার সারা জীবনের স্বপ্ন সাধ, তার অস্তিত্বের মোহন প্রকাশ। কি সুন্দর দেখতে লাগছে ওকে! এত সুন্দর তো আগে ও ছিল না। আর স্বাস্থ্য কি হয়েছে! যেন পেটা তামার মূর্তি। কিন্তু ওকে অমন ম্লান লাগছে কেন! যেন চারপাশের কিছুই ওর একদম বরদাস্ত হচ্ছে না। কেমন যেন একটা বিচিত্র দৃষ্টিতে দেখছে সবাইকে। কেরোসিনের আলো-আঁধারিতেও ওমেপার উদ্‌ভ্রান্ত ক্লিষ্ট চাহনি মিঙমাকে বেদনা দেয়।

মিঙ্‌মার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল হ্যারিকেনের আলোটা তুলে ধরে ওমেপাকে একবার সামনাসামনি ভালো করে দেখে। সেও নিশ্চয়ই মনে মনে ওকে খুঁজছে। কিন্তু লজ্জায় কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না।

ইউ পরিবেশন শুরু হয়ে গেছে। মেয়ে-মরদ সবাই আজ নাচবে

ইউয়ের নেশায়। মাথার উপর দশমীর চাঁদ যখন আরো খানিক উঠে আসবে, বাদু পাহাড়ের কালো কালো ছায়াগুলো আর দেখা যাবে না, তখনই শুরু হবে ওদের নাচ। ওমেপার জন্যই আজকের নাচ। তোর্ষা নদীর বুকের বালি জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্ চিক্ করবে, পুষমাসের ঠাণ্ডা আরো ঘন হয়ে জেঁকে বসবে, আর তখনই শুরু হবে টোটোদের উৎসব নৃত্য। গানও গাইবে একদল মেয়ে পুরুষ। এই মোহিনী রাতে ইউয়ের নেশা যখন রক্তে রক্তে আথালি পাথালি করবে তখন ওমেপা নিশ্চয়ই ওকে খুঁজে নেবে। স্বপ্নাভিসারে মিঙ্মা তখন যাবে তার দয়িতের হাত ধরে। আর সেই নিভৃত অবকাশে ওমেপাকে খুব করে আদর করতে করতে অনেক কান্না সে কাঁদবে। তার এতদিনের সবটুকু জমাট অভিমান আর দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাকে সে নিঃশেষে নিবেদন করবে চোখের জলের ধারায়।

হাতে হাতে ইউয়ের পাত্র ঘুরছে। মাটির গেলাসে মাটির হাঁড়ি থেকে ইউ ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। পরম পরিতৃপ্তিতে সমাগত মেয়ে পুরুষরা তা পান করছে।

ওমেপাকেও ইউ দেওয়া হল। একটু খেয়ে সে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল। ওর এসব ভালো লাগছে না। এতক্ষণ তো দম বন্ধ করে ওদের ছোট কাঠের ঘরটাতে কোন মতে বসে ছিল। বাইরে আসতে তবু একটু ভালো লাগছে। ওদের ঐ অতটুকু ঘরে তারা থাকেই বা কি করে! তার বাবা, মা, ছোট দুটো ভাই, একটা বোন! এরই মধ্যে আবার রান্না খাওয়া সব। আর আশপাশের এই লোকগুলো! এত ঠাণ্ডাতেও জামা কাপড় কারো গায়ে নেই বলতে গেলে। সকলের গায়েও কেমন গন্ধ। সাবান মাখে না কেউ এরা। চানই করত না মাত্র কিছুদিন আগেও। নাঃ, অসম্ভব, হোক না নিজের বাবা-মা-জ্ঞাতি-বন্ধু, কিন্তু এই অসভ্য উলঙ্গ লোকগুলোর সঙ্গে ওমেপা কদিন থাকলেই উন্মাদ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যাবে কোথায়! শিলিগুড়ি! দার্জিলিং! কলকাতা! ওর আত্মীয়-স্বজন, এতদিনের পরিবেশ সব ছেড়ে সে সত্যিই কি যেতে পারবে! তার উপর সেই মেয়েটা আছে না! মিঙ্মা না কি নাম! ওর সঙ্গে নাকি তার আবার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে! ছোঃ। একটা দেহাতী জংলী মেয়েকে আবার বিয়ে করতে হবে! গায়ের গন্ধেই তো বমি উঠে আসে। কিন্তু কোথায় সেটা? এখানে আছে তো? নাকি শ্বেতাঙ্গি ওকে বিয়ে করে ফেলেছে এর মধ্যে! এ রকম একটা কথাই তো কিছুদিন আগে তার কানে গিয়েছিল। তা যদি হয় তো একদিকে বাঁচোয়া। শিলিগুড়ি দার্জিলিং কলকাতার ঐ সব আধুনিক উর্বশী কিন্নরী ছেড়ে টোটোপাড়ার এক গাঁইয়া মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ওমেপা নিশ্চয়ই জন্মায়নি। আহা, সে যদি বাঙালী ঘরে জন্মাত! নিদেন কোন নেপালী ঘরে! জীবনটাই তার ধন্য হয়ে যেত।

আইতোয়ার লংগং ছেড়ে সবাই গাঁয়ের মাঠে জমা হতে আরম্ভ করেছে। নাচের বাজনা বেজে উঠেছে তালে লয়ে। গান শুরু হবে একটু পরে। তারপর নাচ। ইউয়ের নেশা প্রতিটি শিরা উপশিরা বেয়ে রক্তে নাচন লাগানো শুরু করেছে আস্তে আস্তে। এবার বাজনার তাল হবে দ্রুত। দশমীর চাঁদের আলো বাঁকা ভাবে বাদু পাহাড়ে পড়বার আগেই নাচেও মত্ততা আসবে। ছন্দে ছন্দে তালে তালে বিশ পঁচিশ জোড়া মেয়ে মরদ নানা ভঙ্গীতে নাচবে। সারা শরীরের ভাঁজে ভাঁজে হিল্লোল তুলে জানাবে আমন্ত্রণ। গানের কথায় শরীর ভাষা পাবে। উদ্দাম নৃত্যগীতে ক্লান্তি নামতে নামতে দশমীর চাঁদ ঢলে পড়বে লংকাপাড়ার দিকে অনেকখানি। তারপর! আঁধারের কোণে কোণে রসের আলাপন ক্লান্তির শেষ রেশটুকুও মুছে দেবে। ভূটান পাহাড়ের মাথায় সূর্যের অলক্ত ছায়াপাতের আগেই উৎসব শেষ হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে শুধু ক্লান্তি ভরা স্মৃতি।

মিঙ্‌মা নাচের তালে বারবার ভুল করছিল। ওমেপা কই! সে তো নাচতে আসেনি। ঐ তো এক কোণে একটা পাথরের উপর বসে আছে। ওর পরনে আছে সেই চক্‌চকে পোশাকটা। যেমনি এসেছিল তেমনিই আছে। শুধু চোখের কালো চশমাটা এখন নেই।

আবার তালে ভুল করল মিঙ্‌মা। আবার। আবার। সখীদের কাছে ধমক খেল কবার। চাপা গলায় ওমেপার নাম করে কারা যেন রসিকতা করল। মিঙ্‌মার একটুও ভালো লাগল না। প্রতিটি মুহূর্তে সে আশা করছিল তার প্রেমাস্পদের সাদর আহ্বান। প্রতিটি ক্ষণেই তার মনে হয়েছে সে উঠে আসবে এক্ষুণি। তার কোমর জড়িয়ে ধরবে।

না। আরো কবার ভুল করে বসে পড়ল মিঙ্‌মা। হবে না। তার দ্বারা আজ নাচ হবে না। কেন যে সে এত ভুল আজ করছে! নিজের উপর ভীষণ রাগ হয় মিঙ্‌মার। ক্ষুণ্ণ মনে একটা অন্ধকার কোণে বসে পড়ল সে।

কতক্ষণ বসে ছিল মিঙ্‌মা জানে না। হয়তো এক দণ্ড। হয়তো আরো বেশি। কিন্তু ওর মনে হল যেন জনম জনম সে বসে আছে এমনি করে। আর রাশ রাশ অন্ধকার যেন ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোন্ এক অতল সমাধিতে।

নিজেকে জোর করে টেনে তুলল মিঙ্‌মা। ওমেপা তার কাছে আসবে না সে বুঝে গেছে। আসার হলে অনেক আগেই আসত। তবে কি সে-ই যাবে নাকি তার কাছে! না। মনটা বিদ্রোহ করতে চায়। ও যদি না এসে থাকতে পারে তবে মিঙ্‌মারই বা কি দায়? দু চোখ ভরে জল আসে ওর। অভিমান ভরে গোটা শরীরটা অবশ শিথিল হতে চায়।

ঐ তো ওমেপা বসে আছে। বসে বসে ঢুলছে মনে হচ্ছে। আহা বেচারা। সারা দিন নিশ্চয়ই খুব ধকল গেছে। তাই অমন ক্লান্ত বিষণ্ণ লাগছে ওকে। গভীর মমতায় মিঙ্‌মার চোখের পাতা ভারী হয়ে যায়। নেশাগ্রস্তের মত

ওমেপার সামনে ইউ ভর্তি গ্লাশ বাড়িয়ে ধরে।—খাবে? খাও। খেলে নেশা জমে। খাওনি বলে এমনি করে বসে আছ তুমি আজকের এমন উৎসবের রাতেও। আর তাছাড়া আজকের উৎসব তো তোমারই জন্য। কতদিন পরে তুমি গাঁয়ে ফিরেছ। খাও।

ওমেপা মিঙ্মার দিকে মুখ ফেরায়। মদালস চোখে মিঙ্মা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এক হাতে ইউ-এর হাঁড়ি, আর এক হাতে মাটির গ্লাস। গায়ে জামা কাপড় কিছু আছে কি? না থাকারই মত। এক টুক্রো নীল কাপড় কোমর থেকে ঘাঘরার মত পরা। বুকের কাঁচুলিও প্রায় খুলে গেছে।

নাও। খাও। মাটির পাত্র তুলে ধরে মিঙ্মা।

ওমেপা গ্লাস তুলে নেয়। এক চুমুকে শেষ করে পাত্র। আজকের এ উৎসবের আমন্ত্রণে সাড়া না দেওয়াটা বোকামী, বিশেষ সামনে যখন এমন সঙ্গিনী দাঁড়িয়ে। মিঙ্মা আবার পাত্র পূর্ণ করে। উদ্যত যৌবনের উদগ্র ইশারায় ওমেপা পূর্ণ পাত্র শূন্য করে।

এঙ্গা সন (এখানে এস)। মিঙ্মা ডাকে। ওর কণ্ঠে রহস্যের মায়াজাল।

কোথায় যাব? দিশেহারা ওমেপা। ও যেন গভীর সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। ডুবতে ডুবতে হাত বাড়িয়ে ও ধরতে চাইছে একটা অবলম্বন।

এঙ্গা সন তোতোয়াওয়াং। (এখানে এস। তাড়াতাড়ি এস।) মদির আঁখি মেলে মিঙ্মা শরাঘাত হানে।

না না না। আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে না। আমি আমার জাতকে ঘৃণা করি। আমি টোটোদের নিতান্ত অসভ্য জংলী মনে করি। তুমি, তুমি মিঙ্মা, তোমাকে আমার ঘেন্না করে। তোমার মত একটা মেয়ের সঙ্গ আমার কাছে অভিশাপ। তুমি যাও। আমাকে একলা থাকতে দাও। আর্ত চিৎকার করে ওমেপা।

মিঙ্মা হাসে। তাই কখনও হয়। আজকের এ রাতে একলা থাকবে কি? এ যে তোমার জন্যই উৎসব। আর আমি যে তোমার বউ, বাগদত্তা বধূ। তুমি এস, আমায় নিঃশেষে নাও। আমাকে সার্থক কর। তুমি যদি আমায় গ্রহণ করে ধন্য না কর তবে শেতাঞ্জিকেই স্বামী বলে আমাকে বরণ করে নিতে হবে। এতে তোমার পৌরুষে কি একটুও আঘাত লাগবে না?

শেতাঞ্জির নাম শুনে ওমেপার চমক ভাঙে। আর এক গ্লাস ইউ খায় সে।

আমি আদিম অরণ্যের আদিবাসী রমণী। আদিম পোশাক ছাড়া আমাকে ভালো লাগবে কেন? তুমিও তো এই পাহাড় জঙ্গলের সন্তান। তোমার গায়ে ঘায়ের মত ওগুলো কি? টোটোর রক্ত তোমার গায়ে। ওসব শহুরে জিনিস খুলে ফেল। আমার আদিম দেহ তুলে নাও তোমার আদিম প্রয়োজনে। মিঙ্মা একটানে নিজের বুকের জামাটা খুলে ফেলে।

ওমেপার মনের মধ্যে গুহাবাসী আদিম মানব যেন জেগে উঠে। ও

নিজেকে দেখে একবার। একবার দেখে মিঙ্মার নগ্ন চিকন দেহ। অদূরে নৃত্যরত মেয়ে পুরুষের দলকেও একবার দেখল। তারপর একটানে খুলে ফেলল শহুরে পোশাক। ছুঁড়ে দিল নাগরিক জীবন-বিলাসের চিহ্নটুকু। তোর্ষা নদীর বাঁক বেশি দূরে নয়। আলো অন্ধকারে মানব-মানবী সেদিকেই এগোয়। দশমীর চাঁদ তখনও বাদু পাহাড়ের গায়ে আলা আলো ছায়া ফেলে চলেছে।

## অসম্পৃক্ত

যেন বন্যার জল বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আসা বাঁধ ভাঙা পাহাড়ী ঢলের তীব্র স্রোতের জল অবিশ্রান্ত ভাবে বয়ে চলেছে। ঐ জলের টান বাড়ছে ক্রমশ। যত রাত বাড়ছে, সন্ধ্যা রাত্রির গভীরতায় যতই হারিয়ে যাচ্ছে, ততই বাড়ছে জলের টান। বন্যার স্রোত। ঢেউএর ধাক্কায় টাল সামলাতে সামলাতে রথীশের মনে হয় কোনোদিনও যেন এ বন্যার বেগ সংযত হবে না। চিরদিন, যতদিন বাঁচবে, ততদিনই সে এই জলস্রোতে নির্মূল একটি গাছ অথবা ভাঙা একটা ডালের মতো ভাসতে থাকবে। নদী থেকে খালে, খাল থেকে মাঠে, মাঠ থেকে গৃহস্থের বাড়ীতে, সেখান থেকে গ্রামের হাটতলা হয়ে, রথতলা ছাড়িয়ে, নদী পুকুর জনপদ একাকার হওয়া জলরাশি থেকে অন্য কোনো পথ ঘুরে সাগরে গিয়ে পড়বে। সাগর মানে যাত্রার শেষ। জীবনের ইতি। মৃত্যু অসীম।

না, অতদূর ভাবতে চায় না রথীশ। মহানবমীর রাত্রে এই স্রোত তো মানুষের মিছিল, জীবনের স্রোত। মৃত্যুর স্পর্শ নেই এতে। এ স্রোত আনন্দের বহতা নদী। অনাদি অখণ্ড নয়, চলিষ্ণু জীবনের সামান্য একটি অংশ। আর একটি দিন মাত্র। তারপরই তো সব শেষ। আনন্দের বিশাল এই স্রোত হয়ে দাঁড়াবে ব্যস্ততার জীবন যাত্রা। বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন গ্লানির সে হবে রং ওঠা অনুবর্তন। তার চেয়ে আজকের বাঁধ ভাঙা বন্যা চলুক, বাড়ুক প্রতি নিমেষে। প্রাণের জয়যাত্রা দীর্ঘায়িত হোক।

কিন্তু আনন্দর এই মিছিলে তার ভূমিকা তো কিছু নেই। রথীশ ভাবে। সে এই স্রোতের অঙ্গ নয়, সজ্জা নয়, সে সম্পূর্ণ অনাহূত। সে এই জীবন সাগরে নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, নির্জন এক ভূখণ্ড। খারাপ লাগতে থাকে তার।

মহানবমীর আলোকজ্জ্বল কলকাতার রাস্তায় একলা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে রথীশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। পথ চলতি অজস্র, অগুনতি হাসি ভরা মুখগুলো দেখতে ভালো লাগে ঠিকই। কিন্তু ভালো লাগার কোন্ গোপন অন্তঃপুরে জমাট পাষাণ ভার আছে তা খেয়াল করেনি সে। তাই কোনো এক সময় ভালো লাগাটা বিতৃষ্ণা হয়ে যায়। মনের গহনে একটা বুভুক্ষা না পাওয়ার বেদনায় চাপা আর্তনাদ করে ওঠে। নবমী

রাতে আলো আর গানে কলকাতা যখন পথে নেমে এসেছে। তখন হঠাৎই বিজয়া দশমীর বিষণ্ণতা চেপে বসে তার মনে।

শ্লথ পায়ে রথীশ হাঁটতে থাকে। চারদিকের খুশীভরা মুখগুলো সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। দল বেঁধে, সার বেঁধে, নয়ত জোড় বেঁধে সবাই চলেছে আলোর রাজ্যে। এরা কেউ একা নয়। দল ছাড়া সঙ্গীহীন নয় কেউ। রথীশ চোখের দৃষ্টি গুটিয়ে এনে দেখতে থাকে। নানা বয়সের মানুষের মিছিলে সেই শুধু সম্পূর্ণ একাকী। কেন! কেন! একটাও সাথী থাকবে না কেন তার! আনন্দের সাথী, দুঃখের বন্ধু! সে কি কেবল মাত্র তার বয়স বেশি বলে! কিন্তু তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি বয়সের লোকেরাও তো চলেছে। দোসরহীন নয়তো তারা কেউ! তবে তার কেন কেউ নেই! কেউ থাকবে না কেন! বয়স তার কম হয়নি ঠিকই। গত ভাদ্রেই সে উনপঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। একথাও ঠিক সে অকৃতদার। কিন্তু বিয়ে না করলে কেউ কি সঙ্গী পায় না! বিয়েই নাকি তবে সঙ্গী পাবার একমাত্র রাস্তা! তবে সে তো এই বয়সে আর হবার নয়। কোনো কালেই হবার ছিল না হয়ত। নয়তো মেয়ে তার জীবনে একেবারে আসেনি তাতো নয়। এসেছে ক'জনই। কিন্তু যেমন এসেছে, তেমনি আলোড়ন না তুলেই চলে গেছে। যে তার কাঁচা বয়সের সবুজ মনটাতে প্রথম কম্পন তুলেছিল তাকে তো ধরে রাখতে পারল না সে। ভাবে, প্রেমে, কল্পনায়, উচ্ছ্বাসে তাকে তো রথীশ জড়াতে চেয়েছিল একান্ত নিবিড় করে। কিন্তু বয়সের আবেগ জড়ানো প্রেমের মূল্য কাঞ্চনে হিসেব করতে শিখে নিয়েছিল সে মেয়ে। তাই রথীশ তাকে প্রত্যাখ্যান না করেও গ্রহণ করতে পারেনি আপন বলে। তবু হয়ত এক সময় তাকেই উজাড় করে দিত হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ। কিন্তু সামন্তদের ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সে যে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল রথীশ অনেক খুঁজেও হদিশ পেল না। খোঁজ পেলেও সে মেয়েকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতই এমন কথাও সে ভাবে না। ফিরিয়ে আনলেই জোড়া কি আর লাগত!

দারুণ সুন্দরী একটি মহিলার দিকে তাকিয়ে রথীশ আনমনা হয়ে যায়। রীণা এমনিই সুন্দরী ছিল। হয়ত বা আরো বেশি। ওর উদগ্র রূপে কত পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়ে মরেছে প্রৌঢ় রথীশ আজ আর তার হিসাব করতে রাজী নয়। সে নিজেও তো মরতে বসেছিল। কিন্তু রীণাই তাকে বাঁচালো। চোখের সামনেই একদিন এক হেমন্তের গোধূলি লগ্নে আমেরিকা ফেরত এক ইঞ্জিনীয়ারকে গাঁট ছড়ায় বেঁধে সে চলে গেল। ভালোই হয়েছিল হয়ত। রীণা কোনোদিনই রথীশের ঘরে আসত না। এলেও থাকত না বেশি দিন সে। আমেরিকা ফেরতের ঘরেও নাকি দীর্ঘকাল বাঁধা ছিল না। ভালোই হয়েছে রীণা রথীশের ঘর আলো করতে আসেনি।

সুন্দরী মহিলাটি ভীড়ের মধ্যে কখন হারিয়ে গেছে। নতুন কাপড়-

জামা, ঘাম আর সেণ্টের উগ্রমিশ্রিত গন্ধের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে রথীশের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সুবেশা যুবতীর দল তার চারদিকে কলরব করে যায়। তাদের মধ্যেই সেকি কাউকে খুঁজতে থাকে! সেই জন যে তার সবচেয়ে আপন হতে পারত!

না, রথীশ কাউকেই কাছে আসতে দেয়নি আর এক হিসেবে। অথবা আর কারো কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেনি। তবু এমনটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত ঘটতে পারত। ঘটতেই চলেছিল। উদগ্র রূপের আগুন ছিল না এখানে। ছিল শ্যামলা রঙের সুশ্রী মায়াবী মুখ একখানা। দৃষ্টিতে তার কোমলতার সঙ্গে বিষাদ মেশানো। কিন্তু না, সেও রথীশের আপন হল না। হতে চাইল না। রথীশ তাকে চেয়েছে মনের একান্ত গভীরে। মুখ ফুটে কোনো দুর্বল মুহূর্তে সে কথা প্রকাশও করেছিল। প্রত্যুত্তরে পেয়েছে দু ফোঁটা চোখের জল। অব্যক্ত বেদনায় ভাঙতে ভাঙতে কেঁপে কেঁপে উঠেছে শান্তা। না এ সম্ভব নয়। সে শুধু বিধবা নয়, তার একটি কিশোরী কন্যাও আছে।

এই প্রায় পঞ্চাশের জড়ত্বে জীবনটা দুর্বহ মনে হচ্ছে। বড্ড দীর্ঘ মনে হচ্ছে সামনের পথটা। বন্যার জলে ভেসে যাওয়া দল ছাড়া কচুরি পানার মতো এই অক্ষম, ব্যর্থ জীবনটা বয়ে বয়ে বেড়ানর কি অর্থ হতে পারে। রথীশের চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। মাথার মধ্যে তীক্ষ্ণ একটা শূল বেদনা শুরু হয়েছে! স্নায়ুতে স্নায়ুতে উপোসী আত্মার কান্না গুমরে গুমরে ওঠে।

আর ভালো লাগছে না মহানগরের এই আনন্দস্রোত। মহানবমীর রাত্রি উৎসবের সকল সজ্জা আর আলোর মধ্যে ক্লিষ্ট করছে প্রাক্-বার্ধক্যের মুহূর্তগুলি। রথীশের রক্তাক্ত হৃদয় কান্নার সংযম ভুলে হাহাকার করে ওঠে।

কোথায় যাবে সে এখন! মেসে! না, সেখানে এখন কেউ নেই। ব্যানার্জি মশাই, যতীনবাবু, অধ্যাপক মাইতি সবাই গেছে নিজের মানুষের কাছে। ঠাকুর চাকররাও আজকে থাকবে না বলে দিয়েছে। তবে এখন কোথায় যাওয়া যায়! শান্তার কাছে! ওর মেয়ে রত্না অনেক করে বলেছিল ওদের বাড়ী যেতে। শান্তা মুখে বিশেষ কিছু বলেনি। ওর যত কথা তা চোখে বলেছিল। কিন্তু না, ওখানেও নয়। ওরা তার কেউ নয়। তার কেউ নেই! কোথাও নেই। সে একা। এত বড় পৃথিবীটাতে শুধু সে আছে—আর কেউ নেই। গর্তের বাসিন্দা সে এক উপেক্ষিত সরীসৃপ যার অন্ধকার জীবনে সঙ্গী থাকে না কখনও জৈবিক প্রয়োজন ছাড়া। হ্যাঁ আজ সে সেই সঙ্গিনীই খুঁজবে। কিছু সময়ের জন্য অন্ততঃ তাকে চাই! স্যাঁতসেঁতে ভেজা মাটির ক্লেদাক্ততায় রথীশ সঙ্গিনী খুঁজতে চলল।

যাদুঘরের কাছাকাছি আসতে সঙ্গিনীর আহ্বান এলো। না এখানে নয়। এত আলোতে, প্রশস্ত রাজপথের সমারোহে সরীসৃপের মিলন হতে পারে না। এর জন্য চাই অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে পিচ্ছিল পরিবেশ।

'পাজামা পরা লোকটির সঙ্গে কথা বলে রথীশ। 'ভালো জিনিস চাই। তাজা মাল। অন্ধকারে নিয়ে এসো।'

'ফিরেশ জিনিস একদম। ভালো রুম আছে, কম ভাড়া। ওখানে চলুন স্যার।'

'না, ময়দানের অন্ধকার আছে কি জন্য? আমি ঐ গাছগুলোর নীচে আছি। ওখানেই আনো।' কুড়ি টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দেয় রথীশ। 'এটা রাখো। ভালো জিনিস হলে আরো পাবে।'

কোনো ক্লাবের তাঁবু এটা। এর পিছনটা ক'টা গাছের জটলা। জায়গাটা বেশ ভেজা ভেজা অন্ধকার। রথীশ আরাম করে বসে। সিগারেট ধরায় এতক্ষণ পরে! টানতে থাকে আয়েস করে।

ওকে আসছে পায়ে পায়ে! পিছনের পাজামা পরা লোকটা ফিরে যাচ্ছে। শাড়ী জড়ানো মূর্তিটার চলার মধ্যে কেমন শ্লথ ভাব। হাঁটার মধ্যে আড়ষ্টতা স্পষ্ট। ফিরেশ জিনিস বলেছিল বটে লোকটা। রথীশ যেন চেরা জিভ লক্ লক্ করে বার করে নিজের শুকনো ঠোঁট চাটে।

'এসো, এখানে বসো।' হাত ধরে মেয়েটিকে পাশে বসায় রথীশ। আকাশে কি মেঘ করেছে! নিশ্চয়ই তাই। নবমীর চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে। জায়গাটা আরো অন্ধকার, আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এইতো উপযুক্ত স্থান, উপযুক্ত পরিবেশ। স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পা দুটো ছড়াতে ছড়াতে মেয়েটির কাঁধে হাত রাখে রথীশ। মেয়েটি কি চমকে উঠল! উঠুক। এবার একটু একটু এগোনো। তারপরই সাপের জোড় লাগা।

'তোমার নাম কি?' মেয়েটিকে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করে রথীশ।

'প্রমীলা।' একটা জড়ানো উত্তর আসে। 'প্রমীলা! বাঃ বেশ নাম!'

রথীশের আর তর সইছে না। সে প্রমীলার জামাটা ধরে টানতে থাকে। পাতলা আবরণের মধ্যে হাতটা ঢোকাতে ঢোকাতে তার নিঃশ্বাস উষ্ণ হয়। দ্রুত হয় বুকের ওঠা নামা! প্রমীলাকে বুকের মধ্যে ঘন করে জড়িয়ে ধরে রথীশের মনে হয় এতদিনে তার জীবনটা সার্থক। সে আর একা নেই। তার একাকীত্ব কোন মায়া বলে ঘুচে গেছে।

নবমীর চাঁদ মেঘের থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আবছা আঁধারে মেয়েটির নরম শরীরটা নিজের কোলের উপর তুলে নিতে নিতে রথীশ ওর মুখে মুখ ঘষে।

প্রমীলা মুখটা একটু সরিয়ে নেয়। 'আমার রেট জানেন তো?' হিস্ হিস্ করে ওঠে সে।

রথীশও চাপা শব্দ করে। নিঃশ্বাস ফেলে ঘন ঘন। ওর লক্‌লকে জিভটা দিয়ে প্রমীলার ঠোঁট দুটো চাট্‌তে চাট্‌তে ওর মনে হয় সঙ্গিনীহীন একাকীত্বের চেয়ে সরীসৃপের মিলন অনেক ভালো।

মেঘ সরে যাচ্ছে। চাঁদ আলো ছড়ায়। মায়াময় স্বপ্নিল অন্ধকার প্রজ্জ্বল হয়। রথীশ একবার মুখ তুলে চায়। চারদিক দেখতে গিয়ে প্রমীলাকে দেখে। এতক্ষণ ওর শরীর দেখেছে। এখন ওর মুখ দেখে ভালো করে।

রোগা রোগা চেহারাতেও মিষ্টি মুখ প্রমীলার। আহা বড্ড কচি মুখ। কেমন নিষ্পাপ। দেখে হঠাৎ মায়া লাগে।

'কত বয়স তোমার?' রথীশ প্রশ্ন করে। হঠাৎই হাত দুটো তার নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। লোলুপ জিভটা যেন আর চেরা চেরা লাগে না।

'কুড়ি চলছে।' প্রমীলার সংক্ষিপ্ত জবাবে হিস্‌ হিস্‌ ভাব নেই।

প্রমীলাকে আরো ভালো করে দেখে রথীশ। বড় বড় চোখ দুটো কেমন যেন দুঃখী দুঃখী। লম্বাটে ক্লান্ত মুখে চাঁদের আলো পড়ে হতাশার খিন্ন ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রুমাল বার করে রথীশ নিজের মুখ মোছে। 'তোমার বাবা কী করেন?'

'আমার বাবা নেই।' নিরুত্তাপ গলায় প্রমীলার উত্তর।

'মা?'

'মায়ের অসুখ খুব।'

হঠাৎই রথীশ উঠে পড়ে। না, হল না। বিবরবাসীর জীবন ভোগ তার হল না। বার্ধক্য সত্যিই তাকে এবার গ্রাস করেছে। এই রোগা রোগা মেয়েটিকে দেখে হঠাৎই তার রত্নার কথা মনে পড়ে। শান্তার মেয়ে। তার মেয়েও হতে পারত।

'কি হল উঠে পড়লেন যে?' প্রমীলা রথীশের হাত ধরে। 'আচ্ছা আপনি আমায় কমই দেবেন।'

হাত ছাড়িয়ে নেয় রথীশ। পকেট থেকে কতকগুলো নোট বার করে। প্রমীলার হাতে সেগুলো গুঁজে দেয় সে। 'টাকাটা ধরো। তোমার পুরো পাওনা। কিছু বেশীই আছে। তোমার মার কাছে ফিরে যাও এবার।'

রথীশ আর দাঁড়ায় না। প্রায় দৌড়নর মতই হাঁটতে থাকে। পিছন থেকে প্রমীলা ডাকে, 'শুনুন, একটা কথা—'

না না, কোনো কথা আর নয়। রাস্তায় উঠে এসেছে রথীশ। রাজপথের মসৃণ পীচের উপর পাশে পাশে চলেছে তার ছায়া। ছায়া দিয়ে একাকীত্ব ঘোচে না! রথীশ একাই থাকবে। যতদিন বাঁচবে ততদিন। এই তার নিয়তি।

## আয়না

ড্রেসিং টেবিলের ফুল সাইজ আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে টাইএর ফাঁস ঠিক করতে করতে অরিজিৎ অবাক হয়ে যায়। আয়নাটার মধ্যে এ কার পূর্ণ আকৃতি ফুটে উঠেছে! পায়ের চকচকে জুতো থেকে বাহারি ফাঁপানো চুল সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার মুখের আলো আয়নায় পিছলে পড়ে তাকে অনেক বেশি সুদর্শন করে তুলেছে। সুদর্শন! হ্যাঁ, সত্যিই অরিজিৎ সুদর্শন। স্বর্ণাভ গায়ের রং, বড় বড় ঝকঝকে দুটো চোখ, প্রশস্ত ললাট, রক্তিমাভ ঠোঁটের পিছনে মুক্তোর মতো দাঁতের মাড়ি, টিকলো নাক আর গম্ভীর ব্যক্তিত্ব তাকে যে বিশিষ্টতা দিয়েছে তার পূর্ণ প্রতিকৃতি সামনের আয়নায় দৃশ্যমান হয়েছে। অরিজিৎ অবাক হয়ে দেখে তার সুন্দর কান্তি। মনটা খুশী খুশী লাগে। হঠাৎই শিস দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।

ঘরে ঢোকে কণিকা। অরিজিতের দিকে তাকিয়ে তার মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটে ওঠে। 'কিগো, অত তন্ময় হয়ে কি দেখছ? নিজেকে?'

সলজ্জ ভাবে হাসে অরিজিৎ। বাঁকা হয়ে আয়নায় তার হাসিটুকুও দেখে নেয়। আনন্দের আতিশয্যে ঘুরে দাঁড়ায় কণিকার মুখোমুখি। দুটো হাত কণিকার কাঁধে রেখে ওর চোখে চোখে চায়। 'আমায় দেখতে বেশ ভালো লাগে, না?'

'হ্যাঁ, বেশ মেয়েলি মেয়েলি চেহারা।' মুচকি হেসে কণিকা উত্তর দেয়।

'মেয়েলি চেহারা! জানো আমি একটা অফিসের রাশভারী কর্তা? আমার কথায় সমস্ত অফিসটা ওঠে বসে? মেয়েলি চেহারা হলে আর অতবড় অফিসটাকে চালাতে পারতাম না। আমার পার্সোনালিটির জন্য সবাই আমাকে ভয় পায়। খাতির করে।'

মনে মনে অরিজিতের কথা সম্পূর্ণ মেনে নেয় কণিকা। এইতো সেদিন অরিজিতের চাকরি, বড় জোর ১০।১২ বছর হবে। আজ সে একটা পুরো অফিসের মাথা। আর সত্যিই ওর মতো এতো বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ অফিসার হঠাৎ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

মুখে অবশ্য একথা মানেনা কণিকা। তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, 'ছাই মাথা! কদিন অফিসে ছুটি নিয়ে আমাকে নিয়ে বাইরে দূরে কোথাও যখন নিয়ে যেতে পারছ না তখন মাথা হয়ে লাভ কি হল!'

'মাথা বলেই তো যন্ত্রণাটা বেশি। অফিসের কাজে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে নিয়ে বেরোই আর ওদিকে অফিসের লোকগুলো নিজেদের ইচ্ছে মতো যা খুশী করে বেড়াক আর কি! তাছাড়া এমনিই তো আজকাল কেউ কাজ করতে চায় না। তার উপর আমি না থাকলে ওদের তো পোয়াবারো।'

ক্ষুন্ন হয় কণিকা। কিন্তু মনে মনে অরিজিতের কর্তব্য নিষ্ঠার প্রশংসা না করে পারে না। মুখে অবশ্য সে ভাব ফোটায় না। ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'আচ্ছা যদি অন্য কোনো সুন্দরী মেয়ে তোমাকে এমন অনুরোধ করত তাহলে কি করতে?'

'অন্য মেয়ে! তুমি কি পাগল হলে কণা! আমাকে এমন কথা বলতে অন্য মেয়ে সাহস করবে? আর তাছাড়া তোমার মতো স্ত্রী যে পেয়েছে সেই বা কিসের জন্য অন্য মেয়ের সঙ্গে এমন অভিসারে বেরোবে!'

খুশী হয় কণিকা। ক্ষণ পূর্বের ক্ষোভটুকুর কথা সে ভুলে যায়। দুহাতে অরিজিতের গলা জড়িয়ে তার বুকে মাথা রাখে নিবিড় পুলকে।

ঘড়ির দিকে তাকায় অরিজিৎ ৯টা বাজে। তাকে এই মুহূর্তে বেরোতে হবে, নইলে সাড়ে ন'টার মধ্যে কিছুতেই অফিসে পেঁছিতে পারবে না। নীচে অনেকক্ষণ থেকে অফিসের গাড়ী এসে বসে আছে।

কণিকার বাহুবন্ধন থেকে আলগোছে নিজেকে মুক্ত করে নেয় অরিজিৎ। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নিচে নেমে যায়। হাসি মুখে কণিকা তাকে বিদায় জানায়।

অরিজিৎ চলে গেলে কণিকা আয়নাটার সামনে দাঁড়ায়। আয়নার ভিতর দিয়ে একবার নিজেকে দেখে নেয়। সে অবশ্যই সুন্দরী। কিন্তু এখন যেন তার নিজেকে আরো বেশী সুন্দর লাগছে। এ হয়ত অরিজিতের একান্ত গভীর প্রেমের পুলকে। হয়ত বা, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই অরিজিতের মতো কর্তব্যনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র ও মহৎ স্বামীর অন্তর সৌন্দর্যের ছোঁওয়া তার মতো সাধারণ মেয়েকেও অসাধারণত্ব দান করেছে। আর তারই প্রকাশ হচ্ছে তার অবয়বে যা দেখে সে নিজেই মুগ্ধ হচ্ছে। খুশী খুশী মনে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে দেখতে কণিকার সমস্ত হৃদয় অরিজিতের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

*　　　*　　　*　　　*

অফিসের বড় সাহেবের ঘর। রিভলভিং চেয়ারে দুলতে দুলতে চোস্ত ইংরাজীতে ডিক্টেসন দিচ্ছেন মুখার্জি সাহেব—অরিজিৎ মুখার্জি। কাঁচুমাচু মুখে ঘরে ঢোকেন বড়বাবু।

ডিক্টেসন শেষ করে বড়বাবুর দিকে চোখ তুলে ধরেন মুখার্জি সাহেব। একটা ফাইলে সই করে সেটা ঠেলে দেন বড়বাবুর দিকে।' 'এ অর্ডারটা আজই যেন ইস্যু হয়ে যায়।' গম্ভীর গলা মুখার্জিসাহেবের।

বড়বাবু অর্ডারটার উপর চোখ বোলান। কেমন যেন ম্রিয়মাণ লাগে তাকে। মাথার পিছন দিকটা একবার অকারণে চুলকে তিনি অর্ধস্ফুটে বলেন, 'স্যার!'

'বলুন।'

'বলছিলাম কি অসীমকে অতদূরে বদলি না করলে হত না! একটু কাছাকাছি, মানে আমাদের হাওড়া বা ব্যারাকপুর অফিসে বদলী করলেই হয়।'

'What!' বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তাকালেন মুখার্জি সাহেব। আপনি বলছেন কি, বড়বাবু? অসীমের নামে চার্জ খুব সিরিয়াস ধরনের। সে একটা ডীলারের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে। এর পরও আপনি তাকে সিমপ্যাথী দেখাতে চান?'

'না স্যার, দোষী হলে ওকে কোনো সিমপ্যাথী দেখানো উচিত না। তবে বলছিলাম, স্যার, ওর বিরুদ্ধে যে চার্জ তা এন্‌কোয়ারীতে বিন্দুমাত্র প্রমাণিত হয়নি। অবশ্য আমরা ৩/৪টে অ্যানোনিমাস কমপ্লেন্ট পেয়েছি তাও সত্য। কিন্তু স্যার ভেস্টেড্ ইন্টারেস্টে ঘা পড়েছে বলেই হয়ত এই চিঠিগুলো এসেছে।' বড়বাবু যেন অনেকটা শক্ত মাটিতে পা রাখতে পারছেন।

'Don't plead for a thief, বড়বাবু। আমি ভালো সোর্সে খবর পেয়েছি যে ও রেগুলার ঘুষ খায়। বেশ কয়েকজন ডিলারের সঙ্গে ওর মাসিক ব্যবস্থা আছে সেকি এম্‌নি!'

'কিন্তু, স্যার, এন্‌কোয়ারীতে এসব কিছুই প্রমাণিত হয়নি।'

'You are arguing too much. এসব এনকোয়ারীতে প্রমাণ হয়না। আপনি এ অফিসের বড়বাবু। আপনি যদি ঘুষখোর দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের জন্য প্লিড করতে থাকেন তাহলে কোনোদিনই এ অফিস থেকে দুর্নীতি দূর করা যাবে না। অসীমের মতো ছেলেরা আপনাদের মতো লোকেদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পায় বলেই এ অফিসের নামে এত কমপ্লেন। ইন্‌কোয়ারীতে প্রমাণ হলে আমি অসীমকে ডিস্‌মিস্ করতাম। হয়নি বলেই ওর এই বদ্‌লী।'

বড়বাবু আর কথা বললেন না। বিব্রত মুখে মাথা চুলকোতে থাকেন। তার দিকে একবার তাকিয়ে মুখার্জিসাহেব ধম্‌কে ওঠেন, 'যান, ট্রান্সফার অর্ডারটা এখনই ইস্যু করার ব্যবস্থা করুন।'

ফাইলটা বাঁধতে বাঁধতে বড়বাবু উঠে যান। সেদিকে একবার তাকিয়ে বিরক্তি সূচক একটা শব্দ করেন মুখার্জি সাহেব। তার সুন্দর মুখে সংকল্পের দৃঢ়তার সঙ্গে একটা ব্যাগ্রতার ছায়া দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়।

অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মিঃ সেন ঘরে ঢোকেন। ইঙ্গিতে তাঁকে বসতে বলে মুখার্জিসাহেব কয়েকটা জরুরী টেলিফোন সারেন।

'Yes Mr. Sen, কি খবর ? সুষমা প্রতীপের ব্যাপারটার কি হল ?'

'প্রতীপ Should be transferred from this office immediately sir, কাজকর্মে মন নেই একেবারে। অফিসে আজকাল আসছে মুখ দেখাতে। প্রায়ই ও আর সুষমা অফিস থেকে পালাচ্ছে ইদানীং। অফিসে থাকলেও দিনরাত গুজুর গুজুর আর হাসাহাসি। অন্যান্য স্টাফের মধ্যে naturally resentment দেখা দিচ্ছে।'

'কি! অফিসের মধ্যে প্রেমলীলা চলছে!' রাগে লাল হয়ে ওঠে মুখার্জিসাহেবের সুশ্রী গৌর মুখ। 'I am the last person to tolarate this. বেলাল্লাপানা করলেই হল!'

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকেন অরিজিৎ মুখার্জি। স্টেনোগ্রাফারকে আসতে বলেন। গট্ গট্ করে অর্ডার দেন—Pratip Sanyal is hereby transfered to Siliguri office in the interest of the Company

একেবারে শিলিগুড়ি! মিঃ সেন বিচলিত হন। 'কাছাকাছি কোথাও দিলে হয়না, স্যার! ছেলেটা এমনিতে ব্রিলিয়াণ্ট। কাজকর্ম শিখেছেও ভালো।'

'তাবলে অফিসে বেলাল্লাপানা করবে?'

'ইসে স্যার, বয়সটা খুবই কম। তাছাড়া ও বোধহয় বাড়ীতে একমাত্র আর্নিং মেম্বার! ও বাইরে গেলে সংসার চালানো কঠিন হবে স্যার।'

'Then transfer to Siliguri is the right punishment, সংসারের যখন এমন হাল তখন প্রেম করার শখ প্রাণে জাগে কেন! He must go. দুনিয়াটা চিনুক ভালো করে। অন্যান্য স্টাফও জানুক ডিসিপ্লিনের ঘাটতি হলে কড়া শাস্তি পেতে হয়।'

মিঃ সেন কথা বাড়ান না। তিনি জানেন অরিজিৎ মুখার্জি কড়া লোক। একবার মুখ দিয়ে যা বেরিয়েছে তার নড় চড় হবে না। অফিস ডিসিপ্লিনের কোথাও কমতি তিনি বরদাস্ত করবেন না। নিজে খাঁটি, তাই অন্যায় আর ফাঁকির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ক্ষমাহীন, কঠোর। কর্তব্যের গাফিলতি আর দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ দুইই তাঁর কাছে সমান গুরুতর অপরাধ। আর এজন্যই এত অল্প বয়সে এত উঁচু পদে কাজ করতে পারছেন।

দু চারটে মামুলী ফাইলে সই করিয়ে মিঃ সেন উঠে যান।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে স্বাতী। মুখে চটুল হাসি। হাল্কা গোলাপী হাতকাটা ব্লাউজে মোড়া তার পেলব দেহের দিকে চেয়ে থাকেন অরিজিৎ মুখার্জি। শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউজ ম্যাচ করে পরেছে স্বাতী। চোখে সুর্মা টানা, টুসটুসে ঠোঁটে আলতো করে ছোঁওয়ানো ন্যাচারাল কালার লিপস্টিক।

'এসো, এসো। কি খবর বলো।' প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ মুখার্জি সাহেবের।

স্বাতী সামনের চেয়ারটায় বসে। দুহাতের কনুই মুখার্জি সাহেবের টেবিলের উপর রেখে সামনের দিকে ঈষৎ ঝোঁকে। ডিপকাট ব্লাউজের ভিতর থেকে দুটো নরম মাংসপিণ্ড লোভনীয়ভাবে উঁকি দেয়। সেদিকে চেয়ে মুখার্জিসাহেবের বড় বড় চোখ দুটো লোভাতুর হয়ে ওঠে। একটা হিংস্র লোলুপতার ছায়া তাঁর চওড়া কপালে দুলে ওঠে।

'আমার আর কি খবর! তোমারই তো নতুন নতুন খবর শুনছি।' ভ্রুকুটি করে স্বাতী।

'কী রকম?' অরিজিৎ কৌতূহলী বোধ করে।

'কনস্ট্রাকসনের বড় কাজটা নাকি আগরওয়ালাকে দেবার ব্যবস্থা তুমি করে ফেলেছো?' রহস্যভরা হাসি হাসে স্বাতী।

'এ খবর পেলে কোথা থেকে?' অরিজিৎ আরো অবাক।

'মোরারকাকে সোজা লোক ভেবেছো?' অর্থপূর্ণ হাসি স্বাতীর মুখে।

'মোরারকা সোজা লোক নয় আমি জানি। আর সেজন্যই আমি আগরওয়ালাকেই এ কাজটা দেব ঠিক করেছি। আর দেব নাই বা কেন? মোরারকাকে যে আগের কন্ট্রাক্টটা পাইয়ে দিলাম, তার বাকি টাকাটা ও আজো দেয়নি কেন?' বিরক্ত গম্ভীর মুখ অরিজিতের।

বিলোল কটাক্ষ হানে স্বাতী। 'ও এই কথা। তুমি তোমার পুরো পাওনা কালই পাবে। ওর লোক তোমাকে পেঁাছে দেবে। আমার সঙ্গে মোরারকার কথা হয়েছে। কিন্তু এ কাজটাও যেন ও পায়। তোমার শেয়ার তুমি ঠিক পাবে। আগরওয়ালা যা দেবে তার চেয়ে অনেক বেশি।'

অরিজিতের চোখ দুটো চক্ চক্ করে ওঠে। টেবিলের ওপাশ থেকে স্বাতীর দিকে একটু ঝোঁকে সে 'টাকা ছাড়াও আমার আরো কিছু পাবার কথা।'

বুক থেকে খসে পড়া আঁচলটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে স্বাতী মিচকি হাসে। 'আবার কি পাবে?'

টেবিলের উপর রাখা স্বাতীর হাতখানা খপ্ করে চেপে ধরে অরিজিৎ। তাকায় ওর দিকে। 'তোমাকে চাই। আর হ্যাঁ, আজকেই চাই।'

'আজই!' তির্যক হাসি স্বাতীর মুখে।

'হ্যাঁ, আজ তুমি, কাল টাকা। তবেই মোরারকার কাজ আবার হতে পারে।'

'কথা দিচ্ছ তুমি?' স্বাতীর কটাক্ষে অতল জলের আহ্বান।

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বল তোমাকে কখন কোথায় পাবো?' উত্তেজিত অরিজিৎ।

'ধীরে বন্ধু। অত ব্যস্ত হয়োনা। বেলা তিনটে নাগাদ লাইট হাউসের সামনে এস। আমার সঙ্গে গাড়ী থাকবে।'

'তারপর ?'

'ডায়মন্ডহারবার বা যেখানে তোমার ইচ্ছা।'

'ডায়মণ্ডহারবার ! মন্দ না। ওখানকার টুরিস্ট লজটা ভালোই। তারপর ?'

'ফিরে এসে পার্ক স্ট্রিটের কোথাও ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড ডিনার।'

'বেশ আমি তিনটের সময়ই যাচ্ছি।'

'কন্‌স্ট্রাকসনের কাজটা ?'

'মোরারকাই পাবে। টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে আগরওয়ালার সিলেকসন আটকে যাবে। নতুন কাজে আমার শেয়ার এ্যামাউণ্টটা কনফার্ম করছ কবে ?'

'কালকেই। আচ্ছা, এখন চলি। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।' স্বাতী উঠে দাঁড়ায়। অরিজিৎও উঠে দাঁড়াল। চেম্বারের বন্ধ দরজাটার দিকে এবার একটু এগোয় সে !

'এখন নয়।' স্বাতী সাবধান করে। আয়ত আঁখিতে আরেকবার শরাঘাত করে অরিজিৎকে। তারপর দরজা ঠেলে বাইরে চলে যায়।

পোনে তিনটের সময় বড়বাবুকে ডেকে পাঠান মুখার্জিসাহেব।

'আমি একটা গোপন খবর পেয়েছি আমাদের কোনো গোডাউন থেকে লুকিয়ে মাল পাচার হচ্ছে। আমি বেরুচ্ছি, দেখি ব্যাপারটা। কখন ফিরব জানিনা। যদি বেশি দেরী হয় তো অফিসে আজ আর ফিরব না। আপনি যেন কাউকে কিছু বলবেন না। তাহলে সবাই আবার পালাবে।'

'আচ্ছা স্যার।'

অরিজিৎ মুখার্জি উঠে দাঁড়ান। একবার ঘড়িটা দেখেন। তারপর বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে যান।

* * *

সন্ধ্যার পরে কণিকা গিয়েছিল নিউমার্কেটে। টুকিটাকি কয়েকটা শখের জিনিস কেনার জন্য। অরিজিতের জন্য অপেক্ষা করেছিল। ও আসেনি। দুপুরে ফোন করে জানিয়েছিল ফিরতে দেরী হবে। কোথায় চোর ধরার কাজে যাচ্ছে। তবু কণিকা সন্ধ্যার পরও ওর অপেক্ষা করেছিল। এখন একলাই এসেছে বাজারে।

রাতের প্রথম প্রহরের আলো ঝলমল চৌরঙ্গী দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কণিকার ভালোই লাগছিল। এখনও বাসে ওঠা যাবেনা। কখনই যায়না। কণিকা একটা ট্যাক্সি নেয়। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা যাক। অরিজিৎ হয়ত ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। ওকে খুঁজছে বোধহয়।

পার্কস্ট্রিটের দিকে ট্যাক্সি চলে। দুপাশ দিয়ে গাড়ীর পর গাড়ী যায়।

আলস্য ভরে সেদিকে চেয়ে থাকে কণিকা। পাশ দিয়ে একটা ক্রিম রংএর অ্যাম্বাসাডার যায়। ওর মধ্যে কারা! সাঁ করে গাড়ীটা চলে যায়। কিন্তু আলো আঁধারেও কণিকার মনে হল সে যেন গাড়ীতে অরিজিৎকেই দেখেছে। কে একটা মেয়েকে প্রায় জড়িয়ে ধরে কথা বলছে। কিন্তু, কিন্তু অরিজিৎ কোথা থেকে আসবে এখন! সেতো গেছে রেড করতে। কারা নাকি গুদাম থেকে সমানে মাল পাচার করছে। তাদের হাতে নাতে ধরতে গেছে সে। তাছাড়া এখানে সে ওভাবে আসতেই পারেনা। বিশেষ অমন নির্লজ্জভাবে বেহায়া কোনো মেয়েকে নিয়ে সেতো যেতেই পারেনা। অফিস যাবার আগে অরিজিৎ কি বলেছিল মনে পড়ে কণিকার। শান্তি পায় সে। ঠিকই। অরিজিতের মতো আদর্শবান ন্যায়নিষ্ঠ ছেলের সম্বন্ধে তার মনে এমন কুৎসিৎ ধারণা এসেছিল বলে সে লজ্জা পায়। কাকে না কাকে দেখে সে অরিজিৎ বলে ভেবেছিল। এ কথা শুনলে অরিজিৎ অবশ্য হা হা করে হাসবে। কিন্তু ওর কাছে সে নিজে অনেক ছোট হয়ে যাবে।

কিন্তু ঐতো অরিজিৎ বসে আছে একটা মেয়ের পাশে! ওর একটা হাত যেন মেয়েটির কাঁধে রাখা। ক্রিম রঙা গাড়ীটা ট্রাফিকের লাল আলোর বাধায় আটকে পড়েছে। কিন্তু সত্যিই ওকি অরিজিৎ! কণিকা দৃষ্টিকে তীক্ষ্ন করে। কিন্তু ভালো করে দেখার আগে ট্রাফিক সঙ্কেত পাল্টায়। ক্রিম রঙা গাড়ীটা মুহূর্তে উধাও। কণিকার মগজে কিন্তু সন্দেহটা বাসা বাঁধতে থাকে। এই তোমার চোরধরা অরিজিৎ!

কণিকার চিন্তা থেমে যায়! বাড়ী এসে গেছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে সে ত্রস্ত পদে বাড়ী ঢোকে। অরিজিৎ ফেরেনি এখনও। আজকাল কোনো দিনও সে এমন সময়ে ফেরেনা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কণিকা। একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে সে অন্যমনস্ক ভাবে পাতা উল্টে যায়। মনের গভীরে গোপন কান্না কেন লতিয়ে উঠতে চাইছে! অরিজিৎ, আমি যেন ভুল দেখে থাকি। আমি তোমায় নিয়ে এমন ভাবছি কেন!

রাত প্রায় বারোটা। ক্লান্ত কণিকার প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। অরিজিৎ একটু আগেই বাড়ী ফিরেছে। চোর ধরার রেডে সে গিয়েছিল। ওর তাই এত দেরী। আহা! বেচারী সত্য ও ন্যায়ের জন্য নিজের বিশ্রাম, আরাম সব কিছুই ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এত ক্লান্ত আজ অরিজিৎ যে সে কিছু খেলনা পর্যন্ত। এমন কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল আর কিছু লোক এদেশে যদি জন্মাতো, কণিকা ভাবে, দেশের চেহারা তাহলে হয়ত পাল্টে যেত। স্বামীর জন্য গর্ব অনুভব করতে চায় সে।

আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ায় কণিকা। একটু ক্রিম আলতো করে মুখে ঘষতে থাকে। উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট আলোয় ওর সারা মুখে দ্যুতি। হঠাৎ-ই কণিকার মনে হয় ওর মুখটা যেন বড্ড ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। যেন প্রচণ্ড আশা

ভঙ্গের বেদনায় ওর মুখ পাণ্ডুর, ম্লান। না না এ মনের ভুল। অরিজিতের জন্য বড্ড দুশ্চিন্তা হয়েছিল, এ নিশ্চয় তারই জন্য। ক্রিম ঘষতে ঘষতে কণিকা নিজেকে ভালো করে দেখতে থাকে।

পিছনে এসে দাঁড়ায় অরিজিৎ। দুহাত দিয়ে কণিকার গলা জড়িয়ে ধরে। গালে গাল রাখে। ভালো লাগে কণিকার। অরিজিত ওকে সামনে টেনে নেয়। মুখ তুলে তাকায় কণিকা। অরিজিতের চোখে চোখ রাখে। একি ওর উজ্জ্বল চোখ দুটো অত লাল কেন! ঘুম ভরা দুচোখ। হ্যা, অরিজিৎ ক্লান্ত, ওর ঘুম পেয়েছে। অরিজিৎ ওর মুখ নামিয়ে আনে। কণিকার ঠোঁটের উপর নিজের ঠোঁট ছোঁয়ায়। অরিজিতের মুখে কিসের একটা গন্ধ! অ্যালকহলের মৃদু গন্ধ কি! অরিজিতের মুখে অ্যালকহলের গন্ধ! তার মানে সে মদ খেয়েছে। অরিজিৎ মদ খেয়েছে! না-না-না, তা হতে পারেনা। হয়নি। সে ভুল ভাবছে। সে নিজের মনকে ধমক লাগায়। আলগোছে নিজেকে সরিয়ে কণিকা অরিজিতের ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়। পাশাপাশি দাঁড়ায় দুজনে!

সামনের আয়নায় দুজনের ছবি। সেদিকে তাকায় কণিকা। সকালবেলার অরিজিৎকে রাতের আলোয় হঠাৎ কেমন বিশ্রী লাগছে। একি! আয়নায় ফুটে ওঠা অরিজিতের মুখে কুৎসিত লোভের বিষাক্ত ক্ষত দগ্‌দগ্‌ করছে কেন! যেন মুখোশ সরে গিয়ে ভেতরের চরম ভণ্ডামী আর জঘন্য লালসা সারা মুখটাকে ঢেকে ফেলেছে। কণিকার মাথা ঘুরতে থাকে। আবার তাকায় আয়নার ভিতর দিয়ে অরিজিতের মুখের দিকে। হিংস্র দাঁতাল বন্য শূকরের মতো অরিজিৎ হাসছে। ওর ঠোঁটের কোণায় লাম্পট্য আর শঠতার পরিষ্কার ছাপ। ওর কপালের ভাঁজে ভাঁজে ধূর্ত প্রতারকের কুটিল পরিচয় লিখন একান্ত প্রত্যক্ষ। তাঁর সুন্দর, সৌম্য, মহৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ স্বামীর চেহারা এমন হয়ে যাচ্ছে কেন! কণিকার চোখের সামনে ত্রিভুবন দুলতে থাকে। সব কিছু হঠাৎ অন্ধকার হয়ে আসে।

অরিজিৎ! অরিজিৎ! তোমার সুন্দর চেহারার আড়ালে এ কোন ভণ্ডামী লুকিয়ে আছে! আমায় ক্ষমা করো অরিজিৎ। তোমার জন্য যে আমার অনেক অনেক গর্ব। তুমি সুন্দর থাকো, হিংস্র কুটিল হয়োনা। লোভীর উদ্যত থাবা তোমায় যেন গ্রাস না করে। আশপাশের সব কিছু প্রচণ্ড-ভাবে দুলে ওঠে কণিকার চোখের সামনে। তাড়াতাড়ি অরিজিৎকে ধরে ফেলে ওর কাঁধে মাথা রাখে। দুচোখ দিয়ে অকারণেই তার অশ্রু গড়াতে থাকে! কিছু বুঝতে না পেরে অরিজিৎ ওকে ধরে দাঁড়িয়েই থাকে!

## পার্টনার

ড্যালহাউসী পাড়ায় এক পুরনো বন্ধুর খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। বন্ধুর অফিসে গিয়ে শুনলাম সে আসেনি আজ। কদিন আরো আসবে না। ছুটি নিয়েছে। একটু হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসছি হঠাৎ জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে দেখা। বিরাট বাড়ীটার ঘরে ঘরে তলায় তলায় হরেক রকম অফিস। তাদের কোনো একটা থেকেই সে বোধহয় বেরিয়ে এসেছে। আমি ওকে ডাকলাম। ও আমায় দেখতে পায়নি।

জ্যোতির্ময় আমার সহপাঠী ছিল এককালে। তিনবারে স্কুল ফাইনাল পাশ করেও আর পড়েনি! তারপর থেকেই ওর সঙ্গে যোগাযোগ কমতে কমতে আর প্রায় ছিল না। বহুদিন পরে, বলতে গেলে প্রায় একযুগ পরে, ওর সঙ্গে দেখা এবং তাও আকস্মিকভাবে।

'জ্যোতির্ময় না?' আমি ডাকলাম।

আন্দাজেই ওকে ডাকলাম। এতদিন পরে ওকে হঠাৎ চিনতে পারাটা বোধহয় খুব সহজ কাজ নয়। ওর বয়স বেশি নয়, আমারই বয়সী প্রায়। চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। কিন্তু এখন দেখলে মনে হচ্ছে চল্লিশের উপর বয়স ওর। মুখের ভাঁজেও বুড়োটে ভাব এসে গেছে। মাথার সামনেটায় চুল সরতে সরতে প্রায় টাক পড়ার উপক্রম হয়েছে।

জ্যোতির্ময় ছেলেবেলা থেকেই গম্ভীর। ওকে দেখলে হঠাৎ সমীহ জাগত মনে। কিন্তু খানিকক্ষণ কথা বললেই বোঝা যায় ও বড় রসিক। সাধারণ কথা এত মজার করে পরিবেশন করত যে অত্যন্ত বেরসিক লোকও না হেসে পারত না! জ্যোতির্ময় নিজে কিন্তু একটুও হাসত না। যত হাসির কথাই হোক না কেন, ওর মুখ যে গোমড়া সেই গোমড়াই থাকত। গুরু গম্ভীর মুখে হাল্কা কথা বলতে পারাটাই যেন ওর স্বাভাবিক বিশেষত্ব। এতদিন পরেও ওর গোমড়ামুখ দেখে আমার পুরনো সব কথা মনে পড়ল।

'আরে জ্যোতির্ময়, তুই এখানে!' আমি আবার চেঁচাই।

জ্যোতির্ময় আমায় দেখে এবার! 'আমাদের নকু! তাই না?'

আমি ঘাড় কাত করলাম। 'তুই এখানে?'

'কেন, আমার কি এখানে আসতে বাধা আছে কিছু? না আমার আসা বারণ?' জ্যোতির্ময়ের গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর লাগে।'

'আরে না না আমি তাই বলছি নাকি ? মানে তুই কি এ বাড়ীতেই কোন কাজকর্ম করিস নাকি ?' আমি থতমত খেয়ে বলি।

'কাজকর্ম ! ও তুইতো কোনো খবরই রাখিস না আমার ! রাখলে জানতিস আমি অ্যান্ড্রু অ্যান্ড রায় কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার। আর, এ বাড়ীর চারতলায় আমার অফিস। তুই আমাদের অফিসটা দেখিস নি ?'

জ্যোতির্ময়ের কথা শুনে আমি অবাক হই। ওর আপাদমস্তক একবার লক্ষ্য করি। নক্‌শাকাটা তাঁতের কাপড় আর আন্দির পাঞ্জাবির সঙ্গে নতুন জুতো পরা জ্যোতির্ময়। দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। হাতে নতুন ঘড়ি। গম্ভীর ভারিক্কি চেহারা। অ্যান্ড্রু অ্যান্ড রায় কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনারের মতই ওকে সত্যিই লাগছে।

সম্ভ্রম জাগে আমার মনে। 'মানে অনেক দিন পরে দেখা তো ! ঠিক খোঁজখবর আমার জানা ছিল না।'

'এ বাড়ীতে আসা যাওয়া করিস আর এ খবরটা রাখিস না ! তা যাক, তুই আজকাল কি করছিস ?'

'একটা মার্কেন্টাইল ফার্মের রিপ্রেজেন্টেটিভ—মানে ওখানে কাজ করি।' আমি ঢোঁক গিলতে গিলতে বলি।'

'অঃ ! রিপ্রেজেন্টেটিভ !' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে জ্যোতির্ময় মাথা নাড়ে।

নিজেকে খুব অসহায় লাগে। আমার বাল্যবন্ধু জ্যোতির্ময় একটা বড় কোম্পানীর সিনিয়ার পার্টনার, আর তার সামনে আমি নকু অর্থাৎ রতন সরকার জীওনলাল রামচাঁদের সামান্য সেলস্‌ রিপ্রেজেন্টেটিভ !

'এ বাড়ীতে তুই কোথায় গিয়েছিলি ?'

'এক বন্ধুর খোঁজে। মানে অর্ডার যোগাড়ের ধান্দা আর কি।' আমি কাঁচুমাচু হই।

'তোদের কোম্পানী ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন—নাকি দালালী মারে শুধু ?'

'হ্যাঁ, ম্যানুফ্যাকচার করে। এই স্টিলের আলমারি, ফার্নিচার এই সব।' আমি অতিমাত্রায় বিনয়ী হতে চাই। জ্যোতির্ময়কে ধরে ওদের কোম্পানীর কোনো অর্ডার যোগাড় করা যায় না। হঠাৎ আমার মনে আশা জাগে।

'তা এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলবি নাকি আমার সঙ্গে এক কাপ কফি খাবি ?' জ্যোতির্ময় এবার চলতে থাকে।

হাতে বিশেষ কোনো কাজ নেই এখন। আমি ওর সঙ্গে এগোই।

দুজনে কাছাকাছি একটা কফির দোকানে ঢুকি। সাদামাটা দোকান। অফিস বাবুদের টিফিনের জায়গা। একটু অবাক হই। অ্যান্ড্রু এ্যান্ড রায় কোম্পানীর পার্টনার এমন জায়গায় ঢুকবে ঠিক আশা করিনি।

'কিরে কি ভাবছিস ? এখানে ঢুকলাম কেন ভাবছিস তো ?'

থতমত খাই একটু। জ্যোতির্ময় অন্তর্যামী নাকি! 'না, মানে এখানে আমাদের খুব চলে। তবে সবাই-এর কি আর এমন জায়গা ভালো লাগবে।'

আমি ভাববাচ্যে কথা বলা শুরু করেছি। অ্যান্ড্রু অ্যান্ড রায় কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনারের সঙ্গে বাল্যকালের বন্ধুত্বের সুবাদে তুই-তোকারী করাটা সমীচীন কিনা ভেবে উঠতে পারছিলাম না।

'মাঝে মাঝে মানে তেমন তেমন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে এরকম জায়গাতেই আসি। বন্ধুরা অস্বস্তি বোধ করে না। আর আমারও ভালো লাগে। সব সময় গ্র্যান্ড আর গ্রেট ইস্টার্ণ কি ভালো লাগেরে?'

জ্যোতির্ময়ের কথাগুলো খুব ভালো লাগে। না, ও একটুও পাল্টায়নি। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে অহমিকা আসেনি। বরং আন্তরিকতাটুকু পুরো-মাত্রায় বজায় রেখেছে।

দুজনে একটা নিরালা কোণে মুখোমুখি বসলাম।

'কফির সঙ্গে আর কিছু খাবি?'

'শুধু কফিই ভালো।'

'দূর! লজ্জা করছিস কেন? খা না কি খাবি। আচ্ছা কাটলেট খা। গরম কাটলেট আছে বলছে।'

জ্যোতির্ময়ের অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। মাথা নাড়লাম। দেখাই যাক না যদি ওর কাছ থেকে কিছু অর্ডার যোগাড় করা যায়।

কফি খেতে খেতে এটা ওটা কথা হ'ল। এক সময় সুযোগ বুঝে আসল কথাটা পাড়লাম।

'অ্যান্ড্রু অ্যান্ড রায় কোম্পানীর কিছু কাজ পাওয়া যায় না?'

'যেতে পারে। তবে তোর কমিশন কত থাকবে তাতে?'

'আমার আর কি কমিশন! এ মাসে একটাও অর্ডার যোগাড় করতে পারিনি এখনও। অর্ডার না পেলে আমার চাকরিটাই থাকবে না। চাকরির শর্তই তাই। প্রাইভেট বেনিয়া কোম্পানীর চাকরি তো!'

'অঃ।' জ্যোতির্ময় হাই তোলে।

কাটলেট আর কফি খাওয়া শেষ হল। অর্ডারের ব্যাপারে জ্যোতির্ময় এখনও কিছু বলছে না।

'চ' উঠি। তোরা পার্টি এন্টারটেন করার জন্য অ্যালাউন্স ট্যালাউন্স পাস না?'

স্বীকার করলাম। 'হ্যাঁ পাই সামান্য কিছু।'

'দামটা দিয়ে দে তবে। আমিও তোর পার্টি। অন্তত আমাকে পাকড়াবার জন্য তোর সামান্য কিছু ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত।'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়।' খুশী হয়ে আমি দাম মিটিয়ে দিলাম।

জ্যোতির্ময়ের সারল্য আর অহঙ্কারবর্জিত মনোভাব ওর প্রতি শ্রদ্ধা

জাগালো। সত্যিই ও অর্থেই শুধু বড় নয়, মনের দিক দিয়েও খুব বড়। মনে আশা জাগল ওর কাছ থেকে কিছু অর্ডার নির্ঘাত হাতাতে পারব।

'চ' গঙ্গার ধারে গিয়ে একটু বসি। বহুদিন পরে তোকে দেখে বড় ভালো লাগছে। ছাড়তে ইচ্ছে করছে না মোটেই।' জ্যোতির্ময় আগের মতই গম্ভীর থাকে।

সানন্দে আমি সায় দিলাম। বহুদিন পরে ওকে দেখে আমারও ভালো লাগছিল বেশ।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসি আমরা। এখান থেকে গঙ্গার ধার খানিকটা দূরে। বেশ খানিকটা হাঁটা রাস্তা। ভাবলাম জ্যোতির্ময় হয়ত এতটা পথ ওর গাড়ীতে যাবে।

ও বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝল। মাথাটা একটু হেলিয়ে আমায় একবার দেখে নেয়। তারপর বলে, 'চ' হাঁটতে হাঁটতে যাই। এটুকু তো পথ ভারী! গাড়ীতে চড়ে চড়ে কোমরে বাত ধরে গেল। মোটেই হাঁটা হয় না তো!'

জ্যোতির্ময়ের প্রস্তাবে আমি রাজী। আর সত্যিকথা বলতে কি ওর সব প্রস্তাবেই আমি এখন রাজী। এখন অর্ডারটার ব্যাপারে পাকাকথা দিলে হয়। সেদিকেই আমি এগোতে চাই। একটা ভালো অর্ডার পাওয়া যাবে তো।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় আউটরামঘাটে এসে পেঁছিলাম। যুৎসই জায়গাতে একটা খালি বেঞ্চি পেয়ে বসি।

'হ্যাঁ অর্ডারের কথা কি বলছিলি?' জ্যোতির্ময় বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করে।

'এই বলছিলাম'—আমি দ্বিধা করি একটু। 'বলছিলাম অ্যান্ড্রু অ্যান্ড রায় কোম্পানীর কাছ থেকে স্টিল ফার্নিচার সাপ্লাই-এর কিছু অর্ডার পাওয়া যায় না?'

'তা পাওয়া যেতে পারে। হয়ত মোটা অর্ডারই হবে। আমাদের একটা নতুন আপিস খুলবার কথা আছে। একদিন হেড আপিসে আসিস। একটা চিঠি দিস তার আগে তোদের কোম্পানী থেকে।'

'কালই না হয় যাবো।' আমি পুলকিত।

'আচ্ছা তাই আসিস। কিন্তু আমায় কত পার্সেন্ট দিবি?'

'পার্সেন্ট!' আমি অবাক হই। জ্যোতির্ময় রসিকতা করছে নির্ঘাত আমতা আমতা করে বলি, 'অ্যান্ড্রু অ্যান্ড রায় কোম্পানীর সিনিয়র পার্ট-নারকে আমার মতো সামান্য রিপ্রেজেন্টেটিভ কি আর পার্সেন্ট দিতে পারে!'

'কেন দিবি না? দরকার হয় তোরা কিছু রেট বাড়িয়ে দিবি।'

'রেট বাড়ালে অর্ডারটা আবার পাওয়া যাবে তো! যা কম্পিটিশনের বাজার!' আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

'আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে। এখন বল কেমন আছিস? তারপর বিয়ে-থা করেছিস নাকি?' জ্যোতির্ময় আরো গম্ভীর হয়।

অর্ডারটা বোধহয় ফস্‌কে গেল। আমি শঙ্কিত হই। পার্সেন্টেজ না হয় দেওয়া যাবে মালিককে বলে। কিন্তু অর্ডার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার তার আগে। সে কথাতেই আসতে হবে একটু পরে। আপাতত ওর কথার জবাব দিই।

'না। বিয়ে-থিয়ে করিনি।'

'কেন?'

'এই মাইনেতে আবার বিয়ে করব কি! চাকরী কবে ছুটে যায় তারই স্থিরতা নেই।'

'অঃ। তা ঠিকই করেছিস। এক হিসেবে বিয়ে না করাটাই সুখের।'

'তুমি বিয়ে করেছ নিশ্চয়ই। ছেলে মেয়ে কি?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'অত তুমি টুমি কি বলছিস রে?' জ্যোতির্ময় এবার যেন একটু হাসল।

'মানে তুই এখন একটা বড় কোম্পানীর পার্টনার। আর আমি!' সহজ হবার চেষ্টা করি।

'তা বটে! আমাকে সম্মান দেখানো তোর কর্তব্য বটে।' জ্যোতির্ময় আবার গম্ভীর হয়। একটু চুপ করে থেকে সে বলে, 'একটা গপ্‌প বলি শোন। আমার এক বন্ধুর গপ্‌প।'

আমি জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকালাম। ওর গল্প শোনার আগ্রহ আমার খুব।

'আমার বন্ধুর নাম অমল। সে কাজ করে একটা ঠিকেদারের কাছে। ঠিকেদার ওকে খুব বিশ্বাস করে। ভালবাসে। মাইনেও মন্দ দেয় না।'

আমি শুনতে থাকি। জ্যোতির্ময় বলতে থাকে। 'অমলের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। দেখতে ওকে তত ভালো না। বয়সের থেকে ভারী লাগে। এই ধর অনেকটা আমার মতো।

'অমল আর ওর বাবার একটু গুল মারার অভ্যাস ছিল। সব কিছুকেই ওরা বাড়িয়ে বলত। তাই বিয়ের কথা যাদের সঙ্গে পাকা হল তারা জানল অমল নিজেই ঠিকেদারী ব্যবসা করে। নতুন হলেও লাইনে ভালো নাম করেছে আর পয়সাও করেছে মন্দ না।

'এই পরিচয়েই অমলের বিয়ে হল। বুঝতেই পারছিস মেয়ে পক্ষের অবস্থা ভালোই আর অমলরা মোটা দাঁও মারল বিয়েতে।'

'বাঃ ওরা মানে মেয়ে পক্ষ ভেরিফাই করল না!' আমি বেরসিকের মতো বাধা দিলাম।

'মেয়ের বাবা বিহারের একটা ছোট শহরের ডাক্তার। ওদের আত্মীয়-

স্বজনও এদিকে তেমন নেই। বাইরে থাকায় ওদের পক্ষে বিশেষ খোঁজ-খবর নেওয়া সম্ভব হয়নি।' জ্যোতির্ময় উত্তর দেয়।

'যাই হোক, বিয়ে চুকে গেল। বৌভাতও চুকল। তারপর দ্বিরাগমন। অমল মালিকের কাছে আগেই বলে রেখেছিল। ক'দিনের জন্য তাই মালিকের গাড়ীটা ম্যানেজ করে নতুন বৌকে পাশে বসিয়ে বীরদর্পে শ্বশুরবাড়ী হাজির হল।

'নতুন জামাই-এর হালচাল আর নতুন গাড়ী দেখে শ্বশুরবাড়ীর সবাই খুব খুশী। জ্যাঠতুতো খুড়তুতো মিলিয়ে অমলের শালা-শালীর সংখ্যাও মন্দ না। তারাতো নতুন জামাইবাবুকে রাতারাতি হীরো বানিয়ে ফেলল। আর তা বানাবেই বা না কেন! জামাইবাবুর গাড়ীতে চড়ে সিনেমা যাওয়া, এখানে ওখানে বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া এমনটা খুবই রাজসিক হতে লাগল। কেই বা না জামাইকে মাথায় তুলে রাখে!

তিনদিন পরেই অমলের ফেরার কথা। মালিকের নির্দেশও তাই। কারণ চারদিনের মধ্যেই তিন জায়গায় টেণ্ডার জমা দিতে হবে। প্রত্যেকটিই মোটা কাজ। কয়েক জায়গায় পেমেন্ট পাবারও কথা। কিন্তু অমল ফিরতে পারল না।

'শালা-শালীরা অমলকে ধরল পাটনা হয়ে নালন্দা—রাজগীর দেখে তবে ওকে ছাড়বে। নতুন বৌ আবার চাইল স্বামীকে নিয়ে একেবারে আগ্রা-দিল্লী যাবে। ওখানেই কদিন থেকে হনিমুন সারবে। অমল কাজের দোহাই পাড়ল অনেক। কিন্তু কাটাতে পারল না। নতুন বৌএর কাজল-কালো চোখ দুটো যখন অভিমানবাষ্পে ভরে উঠল তখন সে অন্য কিছু ভাববার আর সুযোগ পেল না। প্রথমেই ছুটল পাটনা হয়ে রাজগীর। সঙ্গে শালা-শালীর বাহিনী। ফিরেই গাড়ী হাঁকিয়ে বৌকে নিয়ে ছুটল আগ্রা। ওখানে একদিন থেকে দিল্লী। দিল্লীতে আবার দুদিন। ফিরল সাতদিন পরে। বিয়েতে দাঁওমারা টাকাটা সবই নিঃশেষ প্রায়।' জ্যোতির্ময় দম নিতে থামে।

আমার অস্ফুট মন্তব্য, 'ওকি পাগল না বুদ্ধু!'

'বোধ হয় দুই-ই।' জ্যোতির্ময় একটু হাসে।

'তারপর?' আমি জানতে চাই।

'তারপর আর কি! শ্বশুরবাড়ীতে ফেরা মাত্র শ্বশুর গম্ভীর মুখে অমলের হাতে তিনটে টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিলেন। প্রথমটায় অবিলম্বে কলকাতায় ফেরবার নির্দেশ। দ্বিতীয়টায় চাকরী যাওয়ার ভয় দেখানো। একেবারে শেষেরটায় পুলিশে ডায়েরী করার কথাও লেখা আছে।'

'চাকরী না থাকাই উচিত এমন লোকের। এত ইরেসপনসিবল!' আমি মন্তব্য করি।

'ঠিকই।' জ্যোতির্ময় মাথা নাড়ে।

'যাক শেষটুকু বল। চাকরীটা গেল তো?'

'টেলিগ্রাম পেয়ে অমল আর দাঁড়াল না। ধুলো পায়েই গাড়ীতে চড়ল। ওর বৌ ওর হাত ধরে কাঁদল। ও একবার ফিরেও তাকাল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা ফিরে এলো। কলকাতায় ফিরে অমলের ভাগ্যে কি হল বুঝতেই পারছিস। অনেক কান্নাকাটি করেও নিজের চাকরীটা বাঁচাতে পারল না।'

জ্যোতির্ময়ের গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর। চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে ও ভালো করে কাঁচ দুটো মুছে নেয় একবার। আমার দিকে তাকিয়ে একটু যেন হাসেও। তারপর হঠাৎই বলে, 'বাদাম খাওয়াবি?'

অমলের গল্প শুনে আমার কেমন যেন বিভ্রান্তি ঘটে। বোকার মতো প্রশ্ন করলাম, 'হঠাৎ এ গল্প করলি কেন?'

'তুই একটা মস্ত হাঁদা।' মাথায় একটা চাঁটা মেরে জ্যোতির্ময় হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। পরক্ষণেই হাঁটতে শুরু করল। আমিও উঠে ওর পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম।

'শোন্ যে গল্পটা করলাম তার পুরোটা তাপ্পি নয়। প্রথমদিকের অনেকখানিই খাঁটি মাল।'

আমি আরো বোকা বনে গেলাম। 'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ আমিই অমল। আর অ্যান্ড্রু অ্যান্ড রায় কোম্পানীরই অমল। তুই গাড়োল দি গ্রেট।' জ্যোতির্ময় চলার গতি বাড়াল।

'আমার অর্ডারটা?' আমি আরো বোকা বনে যাই।

চলন্ত একটা বাসে উঠতে উঠতে জ্যোতির্ময় উত্তর দেয়, 'কাল আসিস।'

## গরল

হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। সৈকত একটু অবাক হয়। এমন তো থাকে না। বাইরের দরজাটা রোজ রাত্রেই বন্ধ থাকে। সে এমনি রাত করেই বাড়ী ফেরে। আর দরজাটা প্রতি রাত্রেই বন্ধ থাকে। সে রান্না-ঘরের জানলাটায় আস্তে আস্তে টোকা মারে। খানিক পরেই দরজাটা খুলে যায়। খুলে দেয় মা। নিঃশব্দে সৈকত বাড়ী ঢোকে। মায়ের মুখের দিকে তাকায় না বলতে গেলে। তাকাতে চায় না বল্লেই আরো ঠিক বলা হয়। মায়ের মুখে অনেক প্রশ্ন। সে সব প্রশ্নের জবাব জানে না সে। প্রশ্নের মুখোমুখি হতে তাই ভয় পায়। তার চেয়ে মুখের দিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে চলে যাও রান্না ঘরে। সেখানে তার খাবার ঢাকা দেওয়াই থাকে। ঢাকা তোল। গোগ্রাসে খাও। যেদিন ক্ষিধে থাকে না ভালো, সেদিন খাবারগুলো খানিক নাড়াচাড়া করো। কিছু খাও। কিছু রাখো। আর যেদিন ইয়ার দোস্তদের কল্যাণে ভালো মন্দ জুটে যায় রেস্তোরাঁবাজিতে সেদিন ঢাকা খাবার ঢাকা দেওয়াই থাকুক। সকালে বাসি রুটি তরকারি খাবার লোক আছে বাড়ীতে। মা আছে। টুপুর আছে, ঝুমুর আছে, নুপুর আছে।

আজো যথারীতি রান্নাঘরের জানলাটায় টোকা দিতেই যাচ্ছিল সৈকত। কিন্তু ওর চোখে পড়ল ভিতরে আলো জ্বলছে। বাবার ঘরে আলো! এত রাত্রে! তার মানে বাবা জেগে আছে। ফ্যাচাং না বাধায় এখন আবার। সদর দরজার দিকে সৈকত এগোয়।

দরজায় হাত রাখতেই দরজাটা খুলে যায়। না, মা দরজা খুলতে আসেনি। এমনিই ভেজানো ছিল দরজা।

পা টিপে টিপে সৈকত ভিতরে ঢোকে। বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। দেওয়ালের পাশ ঘেঁষে সৈকত উঁকি মারে। বাবা শুয়ে আছে। মাথার কাছে ঝুমুর বসে। মাথায় হাত বোলাচ্ছে। মা কি করছে! মাকে দেখা যাচ্ছে না। বাবাকে দেখা যাচ্ছে। ঘুমুচ্ছে বোধহয়। মুখে যন্ত্রণার ছায়া। থল্‌থলে চেহারাটা লদকে আছে। সৈকত একটু ভয় পায়। শালা কি গেরো বাধল আবার!

আর একটু এগোতেই টুপুরের সামনে পড়ে সে।

'কি হয়েছে রে বাবার?' সৈকত চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করে।

'সে কথা তোমার জেনে কি হবে? তোমার খাবার দেওয়া আছে। খাওগে।' টুপুরের কথাগুলো রসকষহীন।

সৈকত হোঁচট খায়। 'বাবার কী হয়েছে জানতে চাইছি।'

'দেখতেই তো পাচ্ছ শরীর খারাপ।' টুপুর ঝাঁকিয়ে ওঠে।

পাশের ঘর থেকে ত্রস্তে সরলা আসে। 'কি হয়েছে রে? ও সেকু! এসেছিস! তোর বাবার শরীরটা ভালো নেই রে।'

'কী হয়েছে?' সৈকতের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'সকাল থেকেই বলছিলেন শরীর খারাপ। দুপুরে আপিসে মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলেন। প্রেসার খুব বেশী।'

'ডাক্তার দেখেছে?'

'আপিসের লোকেরাই ডাক্তার দেখিয়েছে। বলেছে আপাতত ভাবনার কিছু নেই। তবে সাবধানে থাকতে হবে। হার্টও নাকি ভালো নেই। যাক ওসব। তুই এখন খেয়ে নিগে যা। রাত রয়েছে অনেক।'

সৈকত কথা বাড়ায় না। মায়ের মুখের দিকে তাকায় একবার। আজ সে মুখে প্রশ্ন নেই। শুধুই উৎকণ্ঠা। অনেক শংকার কালো কালো ছায়াগুলো মুখের চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে নেচে বেড়াচ্ছে।

সৈকত রান্না ঘরে চলে আসে। ঢাকা সরিয়ে থালাটা টেনে নেয়। শুকনো রুটি আর ডাল। এক কোণে ও-বেলার তরকারী একটু। এক টুকরো রুটি ডালে ভিজিয়ে মুখে দেয়। ভালো লাগে না খেতে। দূর শালা রোজ রোজ এই শুখা রুটি আর ডালের জল কাঁহাতক গেলা যায়!

মা আসছে। অন্য দিন তো আসে না। আজ কেন! কিছু বলবে বোধ হয়। শালা জ্ঞানদান হবে। বাপের অসুখ। তুমি বড় ছেলে, লেখাপড়া শিখেছ। এবার বাবাকে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করো। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা সবাই বসে আছি।

'কিছু খাচ্ছিস না কেন?' সরলা কাছে এসে দাঁড়ায়।

'ভাল্লাগ্ছে না খেতে।'

'কেন রে?'

'খিধে নেই একদম।'

'যাহোক কিছু খা। একটু দুধ নিবি?'

'দুধ?'

'হ্যাঁ। তোর বাবা খাননি তো আজ।'

'নাঃ। খাবো না।' থালা সরিয়ে সৈকত উঠে পড়ে।

'সেকু, একটা কথা বলব?'

সৈকত শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এবার শুরু হবে। প্রশ্ন। জ্ঞানদান! সুভাষিতম্।

'ত্রিবিক্রমবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলি ?'

'ন্‌না।'

'কেন? তোকে যে অত করে বল্লাম দেখা করতে।'

সৈকত জবাব দেয় না। মা আবার তাগাদা দেয়। 'কিরে দেখা করিস নি কেন ?'

'কি হবে দেখা করে! আমাকে চাকরী দেবে ?'

'দিতে পারে।'

'ঘণ্টা। ও শালার দায় পড়েছে আমাকে চাকরী দিতে।'

'সে সব তো পরের কথা। তুই দেখা করিস নি কেন? ব্যানার্জীবাবু বার বার বলে দিয়েছিলেন তোর বাবাকে।'

'ত্রিবিক্রম শালা ঘুঘু। চোরাই মালের ব্যবসা করে। আমার সঙ্গে দেখাই করেনি।' সৈকত রান্না ঘরের বাইরে আসে।

'তুই দেখা করতে গিয়েছিলি ঠিক ?'

'বল্লাম তো।'

'সত্যি বলছিস তুই ?'

'সত্যিই বলেছি। আজই গিয়েছিলাম। বাড়ীতে থেকেও চাকর দিয়ে বলে পাঠাল, নেই।'

'তুই কাল আবার যা।'

'না। বার বার অপমানিত হয়ে লাভ কি ?'

'আমাদের আবার মান-অপমান!' সরলার গলায় শ্লেষের সঙ্গে হতাশা। পরক্ষণেই কাকুতি। 'তোর বাবার অবস্থা দেখছিস তো!'

'হুঁ।'

'যাবি তো ?'

'ভেবে দেখব। এখন তুমি যাও। শোওগে। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।'

'না, যাবো না। আগে তুই কথা দে।'

'বল্লাম তো, ভেবে দেখব।'

'তুই কি মানুষ, সেকু! দেখছিস তোর বাবার অবস্থা! ভাবনায় চিন্তায় এত রোগ বাধিয়েছে। একবারও কি ভেবে দেখেছিস মানুষটা অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে গোটা সংসারটার হাল কি হবে? এতগুলো প্রাণীর মুখে দুবেলা গ্রাস যোগাবে কে!'

'সে ভাবনা তোমাদের, আমার নয়। খাই তো শুখা রুটি আর ডাল। না হয় কাল থেকে ওটুকুও খাবো না। তাহলে হবে তো ?'

সরলা সৈকতের মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠে। ওর চোখ দুটো যেন জ্বলছে। রাগে ওর মুখটা থম্‌থম্‌ করছে। কিন্তু কিসের রাগ। কেন রাগ! সক্ষম ছেলে থাকলে সংসারের দুঃখের কথা কী তাকে বলব না!

হায় ভগবান ! পোড়া পেটে কি মানুষ আসেনি ! নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সরলা।

না, সরলা নিজেকে সামলায়। এখন ভাব প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। মান-অভিমানকে বড় করে দেখার সময় নেই। বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার। স্পষ্ট করে খোলাখুলি কথা বলার প্রয়োজন সেকুর সঙ্গে। ছল-চাতুরী আর লুকোছাপা করে অনেকগুলো দিন আর বছর গড়িয়ে গেছে। আর সময় বয়ে যেতে দেওয়া যায়না।

'সেকু।'

সরলার তীব্র স্বরে প্রস্থানোদ্যত সৈকত ঘুরে দাঁড়ায়।

'আবার কি বলছ!' মনে ভাবে, মেলা রাত হয়েছে, এখন শোওগে যাও। ঘুম যদি না পেয়ে থাকে তো স্বামী সেবা করগে পতিপ্রাণা সতী সাধ্বী রমণী।

'তুই সবার বড়। ভেবে দেখ তোর বাবার সামান্য ক'টা টাকায় সংসারের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। এখন তো আবার মানুষটা অসুস্থ। আগের মতো খাটতে কতটুকু পারবে কে জানে! সংসারের অভাব আরো বাড়বে। আজই তো ডাক্তারে ওষুধে একগাদা টাকা খরচ হয়ে গেছে।'

'বল্লেতো অফিসের লোক ডাক্তার দেখিয়েছে।'

'তা দেখিয়েছে। কিন্তু ডাক্তার-বদ্যি আর ওষুধের দামগুলো ওদের ধরে দিতে হবে তো! ওগুলো তো আর কেউ দান করেনি।'

'ঠিক আছে ডাক্তার ওষুধের পয়সা আমি দিয়ে দেব। এখন পথ ছাড়। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

সরলার মুখ উজ্জ্বল হয়। 'তুই দাম দিবি! এই তো যোগ্য ছেলের কথা।' পরক্ষণেই সরলা নিষ্প্রভ। 'কিন্তু তুই কোথায় টাকা পাবি? ঐ তো একটা ট্যুইশনি তোর ভরসা। ওতে তো নিজের খরচই চলে না তোর। মাঝে মধ্যেই আমি তোকে লুকিয়ে টাকা দিয়েছি।'

আবার বকছে স্ত্রীলোকটি! সৈকতের ইচ্ছে করে স্ত্রীলোক না বলে মেয়েমানুষ বলে। আরো ভালো হয় মা মাগী বল্লে। কিন্তু না, গভভোধারিনী মা জননী। ঐ শালা কি যেন একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে! জননী জন্মভূমিশ্চ কি সব যেন! মা স্বর্গের চেয়ে বড়ো, মাকে শালা অসম্মান কোর না।

'আমি আর একটা ট্যুইশনি যোগাড় করে নেব।'

'ট্যুইশনিতে কি সংসারের দুঃখ ঘোচে বাবা! তুই ত্রিবিক্রমবাবুর কাছে গিয়ে একটু ধরাধরি কর। ব্যানার্জীবাবু বারবার তোর বাবাকে বলেছে ত্রিবিক্রম একটু সদয় হলেই তোকে ওদের কোম্পানীতে ভালো কাজ দেবে।

সংসারের মুখ চেয়ে তুই কথা দে, সেকু, নিজের সম্মানটাকে বড় করে দেখবি না। দরকার হয়তো খোসামোদ করেও ওঁকে ধরে থাকবি তুই। দেখবি উনি তোকে ঠিক কাজ দেবেন। লেগে থাকলে তোর একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই উনি করবেন।'

আচ্ছা ভ্যাজর ভ্যাজর করছে তো মহিলাটি। কত রাত হয়েছে সেদিকে খেয়াল আছে! কাল খুব সকালে উঠে একবার মুকুলদের বাড়ী যেতে হবে। মুকুল বলেছে ওদের পাশের বাড়ীর কর্তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। সেখানেই একটা ট্যুইশনি পাবার চান্স আছে। তাছাড়া মুকুলের ছোড়দা একটা এজেন্সী পাইয়ে দেবে বলেছে। কিসের এজেন্সী ভাঙেনি। কিন্তু সকালে উঠতে গেলে এক্ষুণি শুতে হবে। এমনিই রাত বেশ হয়েছে। অতএব কাটাও, গভ্ভোধারিণীকে কাটাও।

'মা, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। সকালে উঠে তোমার ত্রিবিক্রমের কথা ভাবব।'

'ঘুম পাচ্ছে যখন তখন ঘুমোওগে বাবা। ইচ্ছে করলে, মনে হলে তখন ত্রিবিক্রমবাবুর কথা চিন্তা করে কাজ কোরো। আমি আর তোমায় এ নিয়ে কিছু বলব না।' রাগ করে সরলা পাশ ফিরে দাঁড়ায়।

'বাবার শরীর খারাপ। সংসারে এত অভাব আর অনটন! তার মধ্যে নিশ্চিন্ত তুই বড় ছেলে। ঘুম হবে তোর দাদা?' টুপুর। মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় ও কখন এসে দাঁড়িয়েছে সৈকত দেখেনি। কথার ধরনে গা জ্বলে যায়। অহো, সংসার সোহাগিনী, বাপ-মায়ের কষ্টের একমাত্র বোঝনদার বাণী দিচ্ছেন। ওসব বাণী ফানী আমায় কেন বাবা! যাওনা, শ্রীকুমার আছেই তো এজন্য। ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ, খাও! আমি কাউকে বলতে যাচ্ছিনা। লেকিন্ মুঝে তং মৎ কর্না।

'নিজের কাজে যা টুপুর। আমাকে বেশি কিছু শেখাতে আসিস না।'

'তোমাকে আর কি শেখাব, দাদা! তুমি শুধু একটু দরদ দিয়ে বাবা-মার দুঃখটা বোঝ, তাহলেই হবে।'

আহারে জ্ঞানদাসী! দরদ কাকে বলেরে! দরদ তোরই তো মনোপলি বাপ্। যানা ঐ দরদ দিয়ে কিছু রোজগার করে মায়ের হাতে দে। নগদা ফেলে দরদ দেখা। 'ম্যালা খ্যাচর খ্যাচর করিস না, টুপুর। দরদ তুইও তো দেখাতে পারিস।'

'আমার দরদ নেই! মা, শোনো তোমার পুত্তুর কী বলছে!'

'রাখ তোর দরদ। মুখের দরদ কে চায় রে? নগদা ফেলে দরদ দেখা।'

'হ্যাঁ, তাই দেখাবো এবার। লেখাপড়া শিখে ধর্মের ষাঁড় হয়ে তুমি বসে আছ যখন, তখন আমাকেই রোজগারের পথ দেখতে হবে। তাই দেখব। কিন্তু ছেলে হয়ে জন্মে সে রোজগারের ভাত তুই কোন মুখে খাস দেখব।'

'তোর রোজগারের ভাতে পেচ্ছাপ করি। নিজের ভাতের ব্যবস্থা নিজে কর আগে।'

কথায় কথা বাড়তে থাকে। গলাও চড়তে থাকে ক্রমশ। হয়ত কোথায় গিয়ে দু ভাই বোন থামত তা ঈশ্বরও জানতেন না। কিন্তু থামল দুজনেই। এবং হঠাৎই। ও ঘর থেকে কাতরানির আওয়াজ আসে। সঙ্গে ঝুমুরের উৎকণ্ঠ ডাক। টুপুর ছুটে যায়। সরলা আসে অন্য ঘর থেকে।

চুপচাপ সৈকত দাঁড়িয়ে থাকে। ওর পায়ে হেঁটে এগোবার শক্তি নেই। একবার ভাবে বাবার ঘরে যায়। অসুস্থ লোকটিকে একবার দেখে আসে। ওকে দেখলে হয়ত এখন আর রাগ হবে না বাবার। হয়ত বা ওকে দেখে রুগ্ন মানুষটা খানিক আশ্বাস পাবে। শালা আশ্বাস! হঠাৎই হাসি পায় সৈকতের। ওকে দেখে বাপ আশ্বাস পাবে! আশ্বস্ত হবে! কদাচিৎ এমন ভাবিও না। তোমার এই চোয়াড়ে চেহারা দেখলে বাবা নামক নিরীহ গোবেচারা ভদ্রলোকটি রাগে এবং দুঃখে, ঘেন্নায় এবং লজ্জায় এক্ষুণি চেল্লানো শুরু করবে। এতে রোগ বাড়িয়ে ফেলতে পারে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় হয়ত বা মাথার শিরা ছিঁড়ে নিঃশব্দ রক্তপাত ঘটাতে পারে, এবং শেষের সেদিন ভয়ংকরকে অগ্রিম ডেকে আনতে পারে। অতএব! কিং কর্তব্যম্! প্রস্থান করো! দ্রুত পলায়ন করো। রাতটা কোনমতে এ বাড়ীর ফাটা ছাদের তলায় কাটিয়ে সকালের আলো ফোট্‌বার আগেই নিঃশব্দে সট্‌কাও। পায়ে পায়ে সৈকত নিজের বিছানাটার দিকে এগোয়।

ভাঙ্গা তক্তপোষের উপর পাতা বিছানায় সৈকত বসে। পকেট হাতড়ে একটা বিড়ি বার করে। দেশলাই জেলে ধরায়। এটি ঘুমের ওষুধ। এতে সুখটান না দিলে নিদ্রাদেবী প্রসন্ন হয় না। নাঃ শালা কাল পরশু ত্রিবিক্রমের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। যেমন করে হোক একটা কাজ জোটাতেই হবে। নিত্য খোঁচা আর সহ্য হয় না। তাও আবার ছোট বোনের কাছে!

এক গ্লাস জল খেয়ে, আলো নিভিয়ে সৈকত বিছানায় শুয়ে পড়ে। চিৎ হয়ে শুয়ে পাটা সোজা করে ছড়িয়ে দিতেই ফচ্ করে একটা আওয়াজ হয়। ডান পাটা কিসে আটকে যায়। দূর শালা, ছেঁড়া চাদরটা আরো ছিঁড়ল। চাদরটা একটু ঘুরিয়ে পাতা উচিত ছিল। কার উচিত ছিল! কেন! টুপুর, ঝুমুর, নূপুরের! তিনটে দামড়ী মেয়ে বাড়ীতে, গাণ্ডে-পিণ্ডে দুবেলা খাচ্ছে আর ছাদে এবং জানলায় দাঁড়িয়ে হিড়িক দিচ্ছে। তারা এসব একটু দেখতে পারে না!

মাথাটা তখন থেকে গরম হয়ে রয়েছে সৈকতের। কিছু একটা করতে হয়। কি করবে! মাস্তান দিলুর কাছে যাবে? ওকে বলবে, একটা কাজ দাও। কিন্তু মস্তানির কাজ সেকি পারবে? কিছু লেখাপড়া শিখেছে যে! সেই শালা ক'বছর আগে বি. কম্ না কি যেন পাশ করে বসে আছে। আবার

টাকা খরচ করে ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমাও পেয়েছে একটা। মাস্তানিটা আসবে কি ওর। ওয়াগন ভাঙা। ছিনতাই। চোরাচালান। ডাকাতি। খুন-খারাবি। হেরোইন-হাশিশ-কোকেনের ব্যবসা। না, শালা না, সে ভদ্দর-লোকের ছেলে, পেটে কিছু বিদ্যে আছে, এসব সে করতে পারবে না। তবে কী পলিটিক্যাল দাদার কাছে যাবে। দাদা তো জনগণের প্রতিনিধি। ওকে বলবে, দাদা, একটা কাজ দাও। রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়া থেকে শুরু করে যে কোনো কাজ। তবে ও দাদা কাজ দেবে না। ওর এখন বাড়ী হয়েছে, গাড়ী হয়েছে, তেল হয়েছে। দিনরাত চাম্চের দল চারপাশে নিয়ে ঘুরছে। তবে হ্যাঁ, দাদা সঙ্গে থাকলে থানা পুলিশের হুজ্জোতি হবে না এটা ঠিক।

শুয়ে শুয়ে সৈকত খুব বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে একটা। সে তাহলে কী করবে। কোথায় যাবে। কেমন করে বাঁচবে। সেকি চিরকাল ন্যাপা গোপ্লাদের মতো চায়ের দোকান, বক্রমবাজি আর রাজা-উজীর মেরে বাপের গলগ্রহ হয়ে থাকবে। বাপের তো এদিকে এই দশা। যখন তখন খসে গেলেই হল। আর তখন কোথায় থাকবে গুলতানি আর বক্রমবাজি।

সমীরের কথা মনে পড়ে। ওর বাবা মারা গেলে দাদা বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। আর সমীর। এক পেট খিধে নিয়ে রাত বাড়লে জয়সওয়ালদের গদীতে হামলা করল। ছোরা মারল ক্যাশিয়ারকে। কিন্তু নোটের তাড়া নিয়ে ভাগবার আগেই ধরা পড়ে গেল। আজ কতদিন হল সে এখনও হাজতে পচছে।

আর ভূদেব। সে তো শালা গ্র্যাজুয়েট। চাকরী না পেয়ে চোরা চালান শিখেছে। ড্রাগের জমজমাটি ব্যবসা করছে। পয়সাওয়ালা ভদ্দরলোকদের ছেলেমেয়েরা ওর ড্রাগ খাচ্ছে। ড্রাগ খাচ্ছে আর ঝিমুচ্ছে। লেখাপড়া মাথায় উঠছে। ভবিষ্যৎ ঝুলে যাচ্ছে। ওদের পয়সাওয়ালা বাপ-মায়েরা কপাল চাপড়াচ্ছে। চাপড়াক। শ্মশানঘাটে সবাই সমান। বড়লোক গরীব লোক সব এক। বেশ করছে ভূদেব। ড্রাগ বেচছে। বিষ ছড়াচ্ছে সমাজে-সংসারে। সমাজ। কিসের শালা সমাজ। সংসার। সংসারের কোন শালা তাদের কী দিচ্ছে? তাদের দুর্দশায় কোন ব্যাটা সাহায্য করতে আসছে? কেউনা। কেউনা। ঠিক আছে, সেও ড্রাগ বেচবে। ড্রাগের বিষ ঢেলে এ পোড়া দেশের ছেলেমেয়েগুলোকে পঙ্গু অথর্ব করে দেবে। সকলের ভবিষ্যৎ ঝর্ঝরে করবে। এই তো বেশ। শালা রোগগ্রস্ত, পঙ্গু সমাজ বানাও। সেটাই হবে প্রতিশোধ। আজকের দুর্দশার বদ্লা। কিন্তু বিবেক। দেশ শুদ্ধ লোকের বিবেক নেই। সে শালা কোন মহাপুরুষ এসেছে। গুলি মার বিবেককে। যেমন করেই হোক টাকা কামাও। ফুর্তি করো, ভোগ করো রাজা বাদশার মতো। নয়ত ত্রিবিক্রমদের দরজায় দরজায় চাকরী ভিক্ষে করে লাথি খেয়ে মর।

না, লাথি ঝাঁটা সে অনেক খেয়েছে ক'বছর ধরে। আর নয়। এবার সে রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও লেখাপড়া, সংস্কার আর বিবেককে। কালই সে যাবে ভূদেবের কাছে, পলিটিক্যাল দাদার কাছে, মাফিয়া সর্দার বাজোরিয়ার কাছে আর মাস্তান দিলুর কাছে। এবার সে কাজ পাবে! টাকা পাবে! সুখ আর ভোগ আসবে টাকার সাথে। বাবার চিকিৎসা হবে, মায়ের শান্তি হবে, টুপুর, নূপুর আর ঝুমুরের বিয়ে হবে।

গভীর স্বস্তি ও শান্তি নিয়ে সৈকত ঘুমোতে চেয়েছিল কিন্তু তার ঘুম আসে না।

## সমুদ্র আহ্বান

ঘড় ঘড় করে রোলিং শাটার তোলার আওয়াজে চমকে উঠল সুপর্ণা। উঃ কি শব্দ! এখানকার নিঃস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে বিকট আওয়াজটা অসহ্য লাগে। এমনিই মেজাজটা যাচ্ছেতাই হয়ে আছে—তার উপর এমন আওয়াজ। বিরক্তির সঙ্গে সুপর্ণা খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে।

সামনেই সার সার গ্যারাজ। এই হাউসিং এস্টেটের গাড়ীওয়ালা মাতব্বরদের গাড়ী থাকে ঐ সব গ্যারাজে।

বাইরে তাকিয়েই বিষণ্ণ বোধ করে সুপর্ণা। সকালের চা খাওয়া কাপ-ডিশগুলো ধুতে ভুলে যায়। খোলা কলটা দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে জল পড়তে থাকে।

ঐ তো এগারো নম্বর গ্যারাজের ভদ্রলোক। কী সুন্দর স্মার্ট চেহারা! পরনে জীন্‌স। গায়ে চৌকো চৌকো লাল কালো নক্‌শা-কাটা হাফ স্লীভ শার্ট। মুখে সিগারেট। এক মাথা রুক্ষ চুল সুবিন্যস্তভাবে ফাঁপানো।

এক মুহূর্তেই পবিত্রর চেহারাটা মনে আসে। রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং। চোখ-মুখে কেমন একটা বোকা ধরনের মোঙ্গলীয় ছাপ। নাকের ডগায় ঝোলানো চশমাটা বহু পুরনো। সব মিলিয়ে চেহারাটা নেহাতই ভোঁতা ভোঁতা। আর পোশাক! সে কথা না ভাবাই ভালো। ঢোলা ঢোলা সেকেলে কাটিং-এর প্যান্টগুলো এখনও অবলীলাক্রমে পরে যাচ্ছে। গায়ের জামাগুলোও সেই কোন্‌ আদ্যিকালে কিনেছিল কে জানে! সাবানে কাচা টেরিলিন-টেরিকটের জামাগুলো ইস্ত্রির সংস্পর্শে কদাচিৎ আসে। পবিত্র এই ভদ্রলোকের ধারে-কাছেও আসতে পারে না। শ্যামল ভূখণ্ড আর ঊষর মরুর ব্যবধান দুজনের মধ্যে।

গ্যারাজের ভিতর ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, কি নাম ওঁর? নাম নিশ্চয়ই খুব সুন্দর কিছু। অন্তত হরিগোপাল বা হারাধন, এমন কি পবিত্র জাতীয় কিছু নিশ্চয়ই নয়। ওঁর নাম কি হতে পারে! দেবব্রত! দেবাশিস! না ওসব দেব টেবের ব্যাপার অমন চেহারার সঙ্গে মানায় না। তবে! ওঁর চেহারা যেমন সপ্রতিভ, তেমনি কায়দাদুরস্ত ওঁর পোশাক। গাড়ীটিও বেশ ঝক্‌ঝকে। নায়কোচিত সব কিছুই। এমন রোমান্টিক

ব্যক্তিত্বের নাম সুপর্ণ হলেই যেন ঠিক হয়। সুপর্ণ! এক লহমায় মুখে হঠাৎই অনেকখানি রক্ত উঠে আসে সুপর্ণার।

গ্যারাজ থেকে গাড়ী বার করে ভদ্রলোক নেমে আসে। টেনে শাটারটা বন্ধ করেন। বিশ্রী আওয়াজ ওঠে। এবার যেন আওয়াজটা অতটা কর্ণভেদী লাগে না সুপর্ণার কাছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস সুপর্ণার বুক চিরে বেরিয়ে আসে। কত শখ তার একটা গাড়ীর। বাবার গাড়ী আছে। স্বামীরও একটা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু না, পবিত্রটা যা তা। ওর যে শুধু গাড়ী নেই তাই নয়, গাড়ী কিনবার সামর্থ নেই। কিন্তু সবচেয়ে আপসোসের কথা গাড়ী কিনবার মানসিকতাই ওর নেই। ও বলে লটারীতে দশ লাখ টাকা পেলেও গাড়ী কিনবে না কোনোদিন।

সত্যিই পবিত্রটা যেন কী! আজ দীর্ঘ বারো বছর ধরে এমন একটা লোকের ঘর একটানা সে করছে কি করে ভাবতেই সুপর্ণা শিউরে ওঠে। গাড়ী নেই, বাড়ী নেই। সে সব না হয় না থাকল। অনেকেরই তো থাকে না। কিন্তু তাবলে সামান্য শখ-সৌখীনতাও কী থাকতে নেই! ও ঠিক একটা মরচে ধরা পুরনো যন্ত্র। ক্যাঁচকোঁচ করে কোনোমতে জীবনটাকে চালিয়ে নিচ্ছে। আর সেই সঙ্গে প্রত্যহের অজস্র দৈন্য আর গ্লানিতে সুপর্ণার এমন সুন্দর জীবনটাকে মাটি করে দিচ্ছে।

ভীষণ রাগ হয় সুপর্ণার। ইদানীং এই একটা রোগ হয়েছে ওর। কথায় কথায় রাগ হয়ে যায়। বিশেষ পবিত্রর উপর। পবিত্রর কোনো কথাই ওর ভালো লাগে না, কোনো কাজ তার পছন্দ নয়। আর সত্যিই ভালো লাগার মতো, পছন্দ করার মতো কোনো কিছু পবিত্র করে কী! নিজেকে নিয়েই ও দিবারাত্রি ব্যস্ত। তার অফিস, তার মা, ভাই, বোন, তার একান্ত অন্তর্মুখী জীবন এসব সুপর্ণার জন্য কোনো আনন্দ সম্ভারই বহন করে না। ওর কাছে সে যেন ঘরের আর পাঁচটা জিনিসের মতো একটা নিছক অস্তিত্ব মাত্র। তার সাধ-আহ্লাদ. শখ-সৌখীনতা কোনো কিছুরই এক কানাকড়িরও মূল্য নেই পবিত্রর কাছে। সুপর্ণা তার কাছে রান্না করে দুবেলা খাওয়ানো আর ঘর-সংসার দেখার একটা যন্ত্র মাত্র। কেমন করে এমন একটা লোকের সঙ্গে সে একটানা এতগুলো বছর কাটাল ভাবতেই সুপর্ণা আর একবার শিউরে ওঠে।

রাগ করার কথা তার মেসোমশাই-এর উপরও। তিনি যে কি দেখে পবিত্রকে পছন্দ করেছিলেন কে জানে। বলতে গেলে একরকম সাধারণ একটা চাকরী করে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা দপ্তরে। একটা না হয় ডক্টরেট ডিগ্রীও আছে। এরকম ডক্টরেট আজকাল ঘরে ঘরে। সে নিজেও তো এম্. এ. পাশ করেছিল একদিন। চেষ্টা করলে হয়ত একটা ডি. ফিল বা পি. এইচ. ডি করতে পারত। শুধু ডক্টরেট ছাপ দেখে এ যুগে পাত্র বাছাই যে করে তার ভবিষ্যৎ

দৃষ্টি সম্বন্ধে সুপর্ণার যথেষ্ট সন্দেহ। নইলে সুপর্ণার মতো মেয়ের সঙ্গে সত্যিই কি পবিত্রর মতো ছেলের বিয়ে হবার কথা! স্বচ্ছল ঘরের সুন্দরী বিদুষী সে, তার পাণি প্রার্থনা করে কত ভালো ভালো ছেলে এসেছে। সুপর্ণা নিজেই তো অনেক ক্ষেত্রে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পবিত্রর বেলায় কী যে হল! কুমারী মনের সরল হৃদয়ের গভীরে পবিত্রর হাহা করা উচ্চহাসি আর পাণ্ডিত্যময় উজ্জ্বল দুটো চোখ কেমন করে যে শরাঘাত করেছিল তা সে বোঝেনি। নইলে মেসোমশাই-এর একার পছন্দে পবিত্রর সঙ্গে তার বিয়ে নিশ্চয়ই হত না।

গাড়ীতে উঠে স্টীয়ারিং ধরে বসে সুপর্ণ। সুপর্ণই কি! থাক, এই নামটাই সুপর্ণার পছন্দ। স্টার্ট দেবার আগে আনমনে একবার সে তাকায় সামনের দিকে। খোলা জানালা দিয়ে চোখাচোখি হল সুপর্ণার সঙ্গে। একটু ক্ষণ। সুপর্ণার সারা শরীরে মধুর ধ্বনি তরঙ্গে ভেঙ্গে পড়ল। অনেক দিন পরে হঠাৎই যেন তার মনের তারে কে চম্পকাঙ্গুলির পরশ ছোঁয়াল। দাঁড়াও সুপর্ণ, একটু অপেক্ষা করো! আমি চট্ করে তৈরি হয়ে আসছি! এই কাপ-ডিশ ধোওয়া, রান্না করা, ছেলে মানুষ করার জীবন আর নয়। এবার তোমার সঙ্গে তোমার ঝক্‌ঝকে নতুন গাড়ীতে আমাদের নিরুদ্দেশ বিহারের পালা। কত জায়গায় ঘুরব তোমার সঙ্গে, কত দেশ দেখব দুজনে! নালন্দা-রাজগীর থেকে তাজমহল-জয়পুর, বিবেকানন্দ রক থেকে গুলমার্গ! তোমার সুন্দর পোশাক আর শরীরের স্পর্শে আমি মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গীর মতো নভোচারী হব। দাঁড়াও, সুপর্ণ! প্লীজ! এক্ষুণি যেয়ো না। একটু দাঁড়াও আমার জন্য!

সুপর্ণ দাঁড়াল না। হর্ন বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। উন্মন হয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইল সুপর্ণা।

কতক্ষণ কাটে। পিছনে শব্দ পেয়ে মুখ ঘোরায় সুপর্ণা। থলে থেকে নতুন কাপ-ডিশগুলো নামিয়ে রাখছে পবিত্র। আজ সকালে এগুলো কেনা নিয়েই দুজনের মধ্যে এক পশলা হয়ে গেছে।

'অনেক ঘুরে নিয়ে এলাম। দেখ, এগুলো তোমার পছন্দ হয় কি না।' পবিত্র মুখ না তুলেই বলে।

গ্যাস-স্টোভ থেকে তরকারির কড়াইটা নামিয়ে রেখে সুপর্ণা রান্নাঘরের বাইরে আসে। কয়েক মুহূর্ত দেখে পবিত্রর আনা কাপগুলোর দিকে। মাথার মধ্যে হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে। নিজেকে সংযত করতে করতে বলে ফেলে, 'আর একটু ভালো জিনিস কি আনা যেত না!'

'কেন, এগুলো ভালো নয়?' অপরাধীর মতো মুখ পবিত্রর।

'যত রাজ্যের ওঁচা-পড়া জিনিস এনেছ। নিশ্চয়ই ফুটপাথে সস্তায় বিক্রী হচ্ছিল!'

'দোকান থেকেই কিনেছি। আর এগুলো খুব সস্তা নয় কিন্তু'—

'রাখো, রাখো। তোমায় তো চিনি। ভালো জিনিস বেশি দাম দিয়ে তুমি কিনবে? এই কাপ-ডিশে কোনো ভদ্রলোককে চা দেওয়া যায়? কাজের লোকেরাও আজকাল এমন কাপে চা খায় না।'

পবিত্রর মুখের উপর কেউ হঠাৎ দোয়াত উল্টে দেয়। 'এজন্যই তো তোমায় বলেছিলাম নিজেই পছন্দ করে কেনো!'

'তোমার মতো অবস্থা হলে আমি নিজেই কিনতাম। কিন্তু তোমার সংসারের যাঁতাকলে আমার কোনো বিশ্রাম আছে না অবকাশ আছে! ঝি-চাকররাও বিশ্রাম নেয় ইচ্ছে মতো। নয়ত কাজ ছেড়ে দেয়। আমি তো কেবল পেটভাতার দাসী! মরণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ছুটি নেই আমার! তার আবার পছন্দ করে জিনিস কেনা!'

'বিকালের দিকে বেড়াতে বেড়াতে যদি যাও! আমি না হয় এগুলো ফেরত দিয়ে আসি।'

'হ্যাঁ, তোমার সংসারে শুয়ে শুয়ে আমি তো মোটা হয়ে যাচ্ছি তাই বিকালে বেড়াতে যাওয়া দরকার। বিকালে মেয়েকে নিয়ে নাচের স্কুলে যেতে হবে না?'

'তাহলে—' পবিত্র মাথা চুলকোতে থাকে।

উনুনটা খালি যাচ্ছে। কড়াইটা আবার চাপিয়ে দিতে সুপর্ণা রান্না ঘরে ঢোকে। খোলা জানালা দিয়ে চোখ দুটো আটকে যায় এগারো নম্বর গ্যারেজের বন্ধ শাটারটার গায়ে। সুপর্ণ আবার আসবে। গাড়ী রাখতে আসবে। সুপর্ণ, তোমার সঙ্গে তোমার গাড়ীতে করে নিউ মার্কেটে গিয়ে নিজের পছন্দ মতো ক্রকারীজ কিনব। পবিত্রর আনা কাপ-প্লেটগুলো ওর বাড়ীতেই পড়ে থাকুক।

পবিত্র রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। একটু চুপ করে থাকে। 'কি করব কাপ-ডিশগুলো?'

সুপর্ণা তাকায় ওর দিকে। দৃষ্টিতে ক্ষণেক পূর্বের প্রসন্নতা আর কোমলতা মুহূর্তে উবে যায়। রুক্ষ কঠিন চোখে পবিত্রকে দেখে একটু। 'তোমায় কতদিন বলেছি না এই ঢোলা প্যান্টটা আর পরবে না।'

'পরি না তো! কাছেই গেছিলাম বলে আজ পরেছিলাম।'

'আর এই জামাটা? রং উঠে কি বিশ্রী হয়ে গিয়েছে। তোমার কিছু মনে হয় না এমন কদর্য জামা-কাপড় পরতে?'

'কদর্য! তেমন খারাপ নয়তো এগুলো! ছুটির দিনে ধারে-কাছে যেতে লোকে এমন জামা-কাপড় তো পরে।'

'তুমি ছাড়া আর কেউ পরে না। সৃষ্টির বাইরে তুমি। উঃ, বেশি কাছে এসো না। গায়ে কী দুর্গন্ধ! এত করে বলি দু'বেলা সাবান দিয়ে চান

করবে ! তা শোনো আমার কথা ? সারা দিনে ঐ একবার—তাও কাকচান সাবান ফাবানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তোমার কি হয়েছে বলতো ?' পবিত্র ঈষৎ বিস্মিত হয়ে তাকায় সুপর্ণার দিকে।

'আমার কিছু হয়নি। তুমি নিজের স্বার্থটাকে ছাড়তে শেখো। আর সম্ভব হলে আমার কথা মতো একটু চলতে শেখো।'

ক্ষুব্ধ পবিত্র একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সুপর্ণার দিকে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এরপর যা মুখে আসবে তাই বলবে ও। ওর জিভে বিষ মাখানো আছে। নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত হানতে ওর জুড়ি নেই। তার দিকে তাকিয়ে একটা কথাও একটু মোলায়েম করে বলবে না সুপর্ণা। ধীরে ধীরে সরে যায় পবিত্র।

কলিং বেল বাজে। কে এসেছে যেন ! সুপর্ণা কড়াইতে জল ঢেলে দেয়।

'গাঙ্গুলি আন্টি।' ছোট্ট সুস্মিতা মাকে খবর দেয়।

হাত ধুয়ে সুপর্ণা বাইরে আসে। মুখে হাসি ছড়িয়ে মিসেস গাঙ্গুলিকে অভ্যর্থনা জানায় সে। 'আসুন, আসুন ভাই।'

'আজ টিভিতে মহাভারত দেখলেন ? খুব জমেছে বলুন !' মিসেস গাঙ্গুলি আলাপ শুরু করে।

'হ্যাঁ, ভাই। তবে আমাদের তো সাদা-কালো। এতে কি মহাভারত—রামায়ণ ভালো লাগে বলুন ? আপনারা কালারে দেখে ঠিক এন্‌জয় করছেন।'

'এটা ঠিক বলেছেন। কালারে দেখার পর আর সাদা-কালোতে দেখাই যায় না। আজ বিকালে দিল্লীর পুরো উদ্বোধনীটাই টিভিতে দেখাবে। হরেক রকম আলোর খেলা দেখাবে। আসুন না কালারে দেখবেন। খুব ভালো লাগবে।'

রাজী হয় সুপর্ণা। তারপর প্রসঙ্গান্তরে যায় দুই গৃহিণী। 'দেখুন তো ভাই এই ঢাকাটা কেমন হয়েছে !' সুপর্ণা সদ্য কেনা টিভির ঢাকাটা দেখায়। 'অবশ্য আপনার যা আছে তার কাছে কিছুই না।'

'না না, এটাতো খুব ভালো হয়েছে। দামও অনেক পড়েছে নিশ্চয়ই।'

'একটু দাম বেশি হলেও জিনিসটা ভালো, বলুন ? কম দামে জানেন ভালো জিনিস ঠিক পাওয়া যায় না।'

'যা বলেছেন। সস্তার তিন অবস্থা। আচ্ছা, উঠি ভাই এখন। ফ্রীজটায় কি একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কোম্পানীতে একটা ফোন করতে হবে।'

মিসেস গাঙ্গুলি চলে যায়। এক মুখ হাসি নিয়ে তার সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সুপর্ণা। দরজাটা বন্ধ করে নিজের ঘরের দিকে তাকাতেই ওর সারা

শরীর জ্বলে ওঠে। ওঃ এটা কি বসবার ঘর। কি বিশ্রী রং-ওঠা একটা জীর্ণ সোফাসেট ঘরে! কোণে একটা নড়বড়ে টেবিল। তার উপর গাদা-খানেক বইপত্র রাখা। একটা ভালো সোফাসেট কিনতে কতবার পবিত্রকে বলেছে। গা করেনি। বলে এইতো আছে বেশ।

ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, সাজানো এ সবে পবিত্রর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অথচ লোকে কত কিছু দিয়েই না ঘর সাজায়! অন্তত বাইরের ঘরটা তো সাজিয়ে রাখতে হয়! পবিত্রর কোনো চেষ্টা নেই, আগ্রহ নেই! কোনো শখও নেই। সেই সঙ্গে সুপর্ণার সাধটুকুকেও সে পিষে মারছে! না, কোনো শখ আর জীবনে পূর্ণ হবে না সুপর্ণার। কালার টি ভি, ভি সি আর, মিক্সি, ওয়াশিং মেশিন---কিছু না, কিছু না। যা কিনতে চাইবে সুপর্ণা তাতেই পবিত্রর আপত্তি। অনেক খরচ এতে। দরকার নেই!

দরকার নেই, দরকার নেই শুনে শুনে কান ঝালাপালা। কী দরকার আছে তাহলে! দুবেলা শুধু পেটের গর্ত বোজানো ছাড়া সংসারে আর কিছুরই কী দরকার নেই! কোনোমতে বেঁচে থাকাটাই কি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য? সংসারে থাকতে গেলে কিছু ভালো ফার্নিচার, ইলেকট্রনিক্সের জিনিসপত্র, টেলিফোন এসব লাগে। আরো লাগে ভালো জামা-কাপড়। ড্রইংরুমে একটা ভালো সোফাসেট, জানলার পেলমেটে ঝোলানো ভারী বাহারী পর্দা, কিছু পুতুল, কিউরিও আর বই দিয়ে সাজানো একটা বুক কেস, দু-চারখানা ভালো ছবি, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বেড়াতে যাওয়া, সপ্তাহে একটা সিনেমা বা থিয়েটার দেখা। দু' একদিন হোটেলে খাওয়া—এগুলো কি খুব কিছু! অনেক টাকা লাগে নাকি এ সবের জন্য? অথচ এগুলো থাকলে জীবনটা সদর্থক মনে হয়। বাঁচার একটা প্রয়োজনীয় অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

না, পবিত্রকে বলে কিছু লাভ নেই। এসব নিয়ে অনেক বলেছে সুপর্ণা। অনেক অনেক দিন এ সবের জন্য অনেক ঝগড়া করেছে। পবিত্রর নিরুত্তাপ, নিস্পৃহ ভঙ্গীতে অনেক কামনার ফুল ঝরে গিয়েছে নিভৃতে। জীবনটা বন্ধ স্কুলে অস্তিত্বের মধ্যে বন্দী থেকে শুধুই বোবা কান্না কেঁদে গেছে। কোনো সাধ পূর্ণ হয়নি। এজন্যই তো আরো তার এত রাগ বেড়ে গেছে আজকাল। তার মনের সমস্ত কোমলতা হারিয়ে সেখানে মরুভূমির হাহাকার সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। পবিত্রকে সহ্য করতে এত কষ্ট হয় আরো।

রান্না শেষ হয়ে গেছে খানিকক্ষণ আগে। সুস্মিতা টেবিলে বসে একা খাচ্ছে। পবিত্র খেতে আসেনি এখনও। শোবার ঘরে খুটখাট করে কী যেন করছে। একটা গাড়ী থামার শব্দ আসে। ব্যস্ত মুখে ত্রস্ত পায়ে

সুপর্ণা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারে। ঐতো সুপর্ণ গাড়ী থেকে নামছে। চোখে একটা রোদ চশ্মা। আরো বেশি স্মার্ট লাগছে ওকে।

ভীষণ শব্দ করে রোলিং শাটারটা উপরে উঠে যায়। ঝক্ঝকে গাড়ীখানা ব্যাক করে গ্যারাজে ঢোকে। স্টার্ট বন্ধ করে নেমে আসে সুপর্ণ। গাড়ীর দরজা খুলে ধরে। একটি সুবেশা তরুণী নেমে আসে। তার চোখেও রোদ চশ্মা। এ কে! একী সুপর্ণর বৌ! না, না, এমন মেয়েকে বউ হিসাবে তোমার পাশে মানায় না, সুপর্ণ। একে তো কালোই বলা যায়। চেহারাটাও মোটার দিকে। ফিগার যে মেয়ের নেই সে আবার রূপসী নাকি!

তোমার বউ-এর চেয়ে আমি অনেক বেশি সুন্দরী, সুপর্ণ! ওকি অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করবার পর আবার এম্ এ পাশও করেছে! ওর মনে কি আমার মতো এত সাধ-আহ্লাদ, কামনা-বাসনা আছে! ওকি রঙীন পাখার ভরে উড়তে জানে! স্বপ্ন সাধের গভীরতায় তুমি ওর কাছে পূর্ণতা পাও! না, না, সুপর্ণ, পাও না আমি জানি। ওই স্থূল বপু, কৃষ্ণাঙ্গী বড়জোর পবিত্রর মতো কারো বউ হতে পারে—তোমার নয়! তোমার সঙ্গে স্বপ্নাভিসারে যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে পারে সে আমি—এই সুপর্ণা—আর কেউ নয়! সুপর্ণার চোখে হঠাৎই বাষ্পাভাষ জমে ওঠে।

রাত প্রায় এগারোটা বাজে। রান্নাঘরের কাজ সেরে এবার সুপর্ণা ঘুমোতে যাবে। ঘুম তার আসবে না সে জানে। আজকাল সহজে তার ঘুম আসতে চায় না। বিছানার ওপাশে পবিত্র অকাতরে ঘুমোয়। কত রাতে জ্যোছনার আলো পড়ে। কোনো দিনও পবিত্রর ঘুম ভাঙে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুপর্ণা শুধু প্রহর গোনে।

আজও সে শোবে ঠিকই। ক্লান্ত শরীরটাকে শুইয়ে না দিলে চলে না। সুপর্ণা জানে শোয়াটাই শুধু হবে—ঘুম আসতে আসতে ঘড়ির কাঁটা অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে যাবে।

রান্নাঘরের জানলা বন্ধ করতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় সুপর্ণা। রাস্তার বাঁকে গাড়ীর আলো দেখা যাচ্ছে। সুপর্ণ আসছে বোধহয়। নিশ্চয়ই কোনো পার্টিতে গিয়েছিল। পবিত্রর মতো এগারোটা বাজার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে না ও।

সুপর্ণার অনুমানই ঠিক। সুপর্ণর নতুন গাড়ীটা এসে দাঁড়াল। ও গাড়ী থেকে নেমে গ্যারাজ খুলতে ব্যস্ত। এ বেলা ওর পরণে ধব্ধবে পাজামা আর পাঞ্জাবি, ঠিক যেমনটি সুপর্ণার পছন্দ। ছেলেদের সন্ধ্যার পোষাক এটাই ভালো। হাল্কা অথচ অভিজাত। অনেকদিন সে পবিত্রকে বলেছে পাজামা-পাঞ্জাবি পরতে। পবিত্র হেসেছে। তারপর যথা নিয়মে

নিজের বিবর্ণ লুঙ্গিখানা হাঁটু পর্যন্ত প্রায় তুলে পরেছে। আর বাইরে যেতে হলে পরেছে ওর সেই আদ্যিকালের ঢোলা প্যান্ট আর শার্ট। ক্কচিৎ কখনও নিমন্ত্রণ রক্ষার তাগিদে ধুতি আর পাঞ্জাবি!

এগারো নম্বর গ্যারাজের শাটার তোলার শব্দ হল। গাড়ী ভিতরে ঢুকল। স্টার্ট বন্ধ করল সুপর্ণ। ওকে ভালো দেখা যাচ্ছে না। গ্যারাজের বাইরে আসতেই রাস্তার আলোয় ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুপর্ণা। সুপর্ণ কি এদিকে তাকাল! রাস্তার আলো স্পষ্ট হলেও যথেষ্ট নয়। মনে হল একটা মৃদু হাসি ফুটে আছে ওর মুখে।

সুপর্ণ ওকে হাসি উপহার দিল নিশ্চয়ই। আর হাসির মধ্যে বুঝি দিয়ে গেল একরাশ স্বপ্নের ফুল।

একি আনন্দ হিল্লোল বইছে সুপর্ণার সারা দেহে! এত হাল্কা লাগছে কেন এখন! এগারো নম্বর গ্যারেজের শাটার নামানোর বিকট শব্দেও কেন সুপর্ণা জল তরঙ্গের মিষ্টি মধুর বাজনা শুনছে!

জানালা থেকে সরে আসে সুপর্ণা। সুপর্ণ চলে গেছে। যাক। ওর মুখের হাসিটুকু অজস্র আলো ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে।

জানলা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে বিছানায় আসে সুপর্ণা। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র ঘুমোচ্ছে অঘোরে। সুস্মিতাও ঘুমে অচেতন। মশারী তুলে সাবধানে শুয়ে পড়ে সুপর্ণা। আজ হয়ত তার ঘুম আসবে না। না আসুক। ঘুম সে চায় না। আজ সে সুপর্ণর চিন্তা করেই মধুর রাত কাটাবে।

অন্ধকারে পাশ ফেরে পবিত্র। সুপর্ণা লক্ষ্য করে না। তার মনে হয় সে যেন সুপর্ণর সঙ্গে তার গাড়ীতে করে অনেক দূরে চলে গেছে।

'কোথায় যাবে?' সুপর্ণ সুপর্ণার চুলে মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করছে!

'যেখানে খুশী। কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা। আমি তোমার সঙ্গে হারিয়ে যেতেই চাই।'

'বেশ তো! তবে চল সমুদ্রের ধারে।'

'তাই বেশ। দীঘা-পুরী-গোপালপুর-ওয়ালটেয়ার যেখানে খুশী। পবিত্রকে অনেক করে বলেছিলাম সমুদ্র দেখাতে। ও দেখায় নি। ওর কোনো শখ নেই। ওর জীবন স্থাণু, জলাবদ্ধ। ও জীবন্মৃত। তুমি নূতন যৌবনের দূত। সুপর্ণ, তুমি আমায় নিয়ে চল সমুদ্রের তীরে।'

ওরা সমুদ্রে গেছে। দামী হোটেলে স্যুইট্ নিয়েছে।

ঘরে বসে স্কচ্ খাচ্ছে সুপর্ণ। মদ খায় ও। খাক্। ও মাতাল হয় না। জীবনকে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে হলে ড্রিংকস অপরিহার্য। পবিত্র জীবন উপভোগ করেনি কখনও। তাই সে আজো মদ স্পর্শ করেনি। মদ খাবার সাহসটাই নেই ওর আসলে। ভীরু, দারুণ ভীরু আর কাপুরুষ পবিত্র।

তাই ভালোমানুষীর মুখোশের আড়ালে নিজের দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করে। কিন্তু পবিত্র, তোমাকে আমার পুরোটাই জানা হয়ে গেছে। তুমি শুধু কাপুরুষ নও, কৃপণ ও স্বার্থপর! না, এখন পবিত্র নয়! ও যেখানে খুশী যাক! গায়ে এখন সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া লাগছে। সামনের খোলা জানালা দিয়ে নীল সমুদ্র ইশারায় ডাকছে। এক্ষুণি ওখানে যাবে তারা।

দারুণ সেজেছে সুপর্ণা। এখন যে ও ইন্দ্রাণী। ড্রিংকসে বাধা নেই। তাই সেও একটা ড্রিংকস নিল। তারপর সুপর্ণার হাত ধরে সমুদ্রের তীর। সেখানে বালুকাবেলায় সব হারাবার সকল পাবার খেলা শুরু।

কিন্তু কি উত্তাল ঢেউ সমুদ্রের! কী সফেন ঢেউ! একটার পর আর একটা ঢেউ ভেঙে পড়ছে বেলাভূমিতে। সুপর্ণ, আমার ভয় করছে। আমার হাত ধরো। সুপর্ণ, কোথায় তুমি? সুপর্ণ, ঝড় উঠেছে। সমুদ্র ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। আরো উত্তাল হয়েছে। আমার হাত ধরো! আমি ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছি। আমি ডুবে যাচ্ছি! তলিয়ে যাচ্ছি একেবারে! সুপর্ণ, ধরো আমাকে। টেনে তোল। জীবন সমুদ্রের সব ঝনঝা তুফান পার করে নিয়ে চলো। পবিত্র নয়! পবিত্র নয়! ও ভীরু, ও স্বার্থপর। ওর স্বপ্ন দেখার মন নেই। সুপর্ণ, তুমি আমার সঙ্গে থাকো। নিয়ে চলো ঢেউয়ের দোলায় দোলায় স্বপ্ন-সাগর পারে। কিন্তু এতো স্বপ্নের ঢেউ নয়, সুপর্ণ, এ যে তলিয়ে দেবার উন্মাদ তরঙ্গ! সুপর্ণ! সুপর্ণ কোথায়! সুপর্ণ নেই, সে চলে গেছে নিরাপদ ডাঙ্গায়। ওর আমাকে আর দরকার নেই। অন্য কোনো মেয়েকে নিয়ে সে বুঝি এতক্ষণে পৌঁছে গেছে সমুদ্র থেকে পাহাড়ে।

সুপর্ণা ভাবে, মৃত্যু এবার আসুক এ বিড়ম্বিত জীবনের অবসান হোক। বাঁচবার আর সাধ নেই তার। কিন্তু না, মধুর জীবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে! বলিষ্ঠ দুটো হাত তাকে ধরে ফেলেছে! নিবিড় করে ধরে সে হাত দুটো তাকে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ পার করে শক্ত মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পরম আশ্রয়দাতা এ হাত দুটো কার! সুপর্ণর হতে পারে না। সে বিশ্বাস-হন্তা। সে আশ্বাস দেয় না। এতো সুপর্ণ নয়। এ কি! এ যে পবিত্র!

অনেক দিন পরে পবিত্রর হাত দুটো বুকের মধ্যে পরম সোহাগে-ভালোবাসায় ধরে রেখে সুপর্ণা খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

# চশমা

নিবিষ্ট মনে ক্রিমিনাল ল জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন মহাদেববাবু—মহাদেব ব্যানার্জী, সেসনস্ কোর্টের দুঁদে অ্যাডভোকেট। একটা অত্যন্ত জটিল মার্ডার কেসের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। ক্রিমিনাল ল জার্নালের পাতায় পাতায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাসঙ্গিক রুলিংগুলো। পাগলের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন হাইকোর্ট মামলার বিবরণের মধ্যে সূক্ষ্ম যুক্তি-জাল যা বিস্তার করে তিনি তাঁর মক্কেল, খুনের কেসের আসামীকে আইনের কঠোর দণ্ড বিধান থেকে ছিনিয়ে আনবেন। টেবিল ল্যাম্পের স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মহাদেববাবুর চোখের ভ্রুকুটি আর কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলো।

আইনের মোটা মোটা বাঁধানো বইগুলোর দুরন্ত আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে মহাদেববাবু কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন একবার। রাত দশটা বেজে গেছে। মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে! খানিক পরে পরেই প্রচণ্ড হুঙ্কারে বজ্রপাত ধ্বনি শোনা যাচ্ছে! প্রবল বর্ষণ আর মেঘের দুন্দুভির সঙ্গে মিশেছে মাতাল ঝড়ো হাওয়া। জলে আর মেঘে, বিদ্যুতে আর ঝড়ে গোটা শহরকে প্রলয় নাচনে নাচার একটা ষড়যন্ত্র মহাদেববাবু আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন।

হঠাৎ তাঁর চিন্তা বাধা পেল। বাইরের সদর দরজায় কে যেন আঘাত করছে। কেউ যেন প্রচণ্ড ধাক্কা মারছে বন্ধ দরজা খোলানোর জন্য। এই দুর্যোগের রাতে কে আর আসবে! বাতাস হবে নিশ্চয়ই। মহাদেববাবু আবার ক্রিমিনাল জার্নালে পেনাল কোডের ৩০২ এবং ৩০৪ ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

আবার বাধা পড়ল। দরজায় ধাক্কা দেওয়া তো বন্ধ হচ্ছেনা। ভালো করে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলেন মহাদেববাবু। কে যেন সত্যিই দরজার কড়া দুটো ধরে প্রাণপণে নেড়ে যাচ্ছে! বাতাস তো আর দরজার কড়া ধরে নাড়াবে না। এতরাত্রে কে আবার এলো! ভ্রূ কোঁচকান মহাদেববাবু।

দরজা খোলার আওয়াজ কানে এলো। হ্যাঁ, ঐ তো রসময়ের গলা পাওয়া যাচ্ছে। সে কাকে বলছে ঃ এতরাত্রে আপনার আবার কি চাই?

কান খাড়া করেন মহাদেববাবু। দাদাবাবুরে ডাকে দেব! তিনি কি আর আছেন এখানে! পিসীমার অসুখের টেলিগারাম পায়েই ওবেলা বাবু তেনারে কইলকাতা পাঠালেন ..কি বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন? তা তিনি তো নেকাপড়া করতিছেন।...আচ্ছা! যান তালি।...হ্যাঁ, ঐ ঘরেই আছেন।

এত রাত্রে কে এমন করে বিরক্ত করতে এলো! আবার তাঁর কাছেই যে আসতে চায়! বিরক্তিতে জ্বলে ওঠেন মহাদেববাবু।

—কে? কে ওখানে? চোখ থেকে পুরু লেন্সের চশমাটা খুলতে খুলতে তিক্ত কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করেন।

—আমি, আমি মাধবী।

নাম শুনে চমকে ওঠেন মহাদেববাবু। তীব্র ঘৃণায় তাঁর নাক কুঁচকে ওঠে। মোটা ফ্রেমের চশমাটা সশব্দে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখেন তিনি।

—মাধবী! ও, তুমিই নিরঞ্জন দত্তের সেই বখা মেয়েটা! তা এত রাত্রে কি চাই আমার কাছে?

—আশ্রয়।

—আশ্রয়! ইয়ার্কি করার জায়গা পাওনা। অসভ্য মেয়ে কোথাকার! আমার কাছে এসেছ আশ্রয়ের জন্য! কেন? তোমার সেই হতভাগা বাবাটার কি হল? সে তোমাকে আশ্রয় দিতে পারছে না?

—না বাবার আশ্রয় আমার ঘুচে গেছে। মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলে মাধবী। পরনের ভিজে শাড়ীটা দিয়ে জল গড়িয়ে মেঝেতে আলপনা আঁকা হয়ে যায়। সেদিকে তাকিয়ে আরো ধীরে সে শেষ করে, আমাকে আর তিনি বাড়ীতে থাকতে দেবেন না!

—কেন! বিস্মিত হন মহাদেববাবু।

—আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবেন। তিনি জানেন সব।

—হোয়াট! গর্জে ওঠেন মহাদেববাবু। তোমার বাবা তোমাকে কেন বাড়ীতে থাকতে দেবে না তার কারণ জানবে আমার ছেলে! ন্যাকামি করার জায়গা পাওনি।

—আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি আশ্রয় চাইছি আপনার কাছে! দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিন। আশ্রয় চাইতে আমি বাধ্য হয়েছি। অন্তত আজ রাতের মতো থাকতে দিন। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাঙা গলায় মাধবী অনুনয় করে।

—তোমাকে আশ্রয় দেব আমি এতই বোকা! তুমিই না আমার ছেলের নামে নানা কথা বলে বেড়িয়েছ? তুমিই না আমার ছেলের নামের সঙ্গে তোমার নিজের নাম জড়িয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছ? তুমি আমার বংশে কালি দেবার ব্যবস্থা করেছ, তাই তোমাকে আশ্রয় না দিয়ে

পারি! ব্যঙ্গ ভরা কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে মহাদেববাবু বলেন। তারপর হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে ওঠেন—'যাও, বেরিয়ে যাও। এক্ষুণি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।'

খানিকক্ষণ থমকে থাকে মাধবী। বড় বড় দুচোখ মেলে তাকিয়ে দেখে মহাদেববাবুকে। তারপর কাতরভাবে বলে, আপনার ছেলে তো শুনলাম কলকাতায় গেছেন। তাঁর মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?

—আমার ছেলে এখানে থাকলেও দেখা হত না। তার নামে মিথ্যা রটনা করেও তোমার শান্তি হচ্ছে না? আবার দেখা করতে চাও! তাও আমারই বাড়ীতে? এত রাতে? তোমার দুঃসাহস দেখে অবাক হচ্ছি। আর হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা হবে না।

—পাঁচ মিনিটের জন্যও কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি না? দুচোখে মিনতি ফুটিয়ে অনুরোধ জানায় মাধবী।

—বললাম তো দেখা হবে না। তোমার মতো জঘন্য মেয়ের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না। কিন্তু তোমার সঙ্গে এত কথা বলার আমার সময়ও নেই, রুচিও নেই। তুমি যাবে কিনা বল! যদি না যাও তাহলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাধবী ভীত ভাবে তাকায় মহাদেববাবুর হিংস্র চোখের দিকে। শঙ্কাকুল নয়নে কাঁচের জানলার বাইরে বিদ্যুতের ছটা দেখে কয়েক মুহূর্ত। কি ভাবে একটু। হঠাৎ তার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। জ্বলজ্বলে দৃষ্টি দিয়ে মহাদেববাবুর দিকে চেয়ে বলে, বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। তবে আশ্রয় দিলেই ভালো করতেন। আপনি আমার সঙ্গে আশ্রয় দিতেন আপনার সন্তানের সৃষ্টিকে, আপনার উত্তর-পুরুষকে।

কয়েক সেকেণ্ড। মহাদেববাবু মাধবীর কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন। তারপরই বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লেন তিনি। প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন—গেট আউট, গেট আউট ইউ বিচ। পাজী বদমাইশ, ইতরামীর জায়গা পাও না?

মাধবী শান্ত দৃষ্টি মেলে মহাদেববাবুকে একটু দেখল। তারপর ধীর মন্থর পদক্ষেপে দরজা খুলে বাইরের অন্ধকার আর গভীর দুর্যোগের মধ্যে হারিয়ে গেল।

মহাদেববাবুর চিৎকার শুনে উপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন করুণা। শঙ্কিত মুখ তাঁর। —কি হয়েছে? এত চ্যাঁচাচ্ছ কেন? কাকে বার করে দিলে?

মহাদেববাবু উত্তেজনায় তখনও কাঁপছেন। কম্পিত হাতে টেবিলের উপর থেকে চশমাটা তুলে নিলেন। —নিরঞ্জন দত্তের সেই পাজী মেয়েটা একটু আগে এসেছিল আমার কাছে।

—কে মাধবী! সে কেন এসেছিল? কি চাইছিল সে এতরাত্রে? বিহ্বল করুণা প্রশ্ন করেন।

—আশ্রয়। দেখেছ বেহায়া মেয়েটার দুঃসাহস? এতরাত্রে আমার কাছে আশ্রয় চাইতে এসেছিল।

উৎকণ্ঠিত করুণা। কেন ওর বাবা?

—সে নাকি তাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ করেছে। এমন মেয়েকে কেন ঘরে রাখবে? ও তো এখন একটা পাব্লিক উওম্যান। আবার বলে কি না তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

—তাই নাকি? আমায় ডাকলে না কেন? আমার কাছে ও হয়ত সব কথা বলতে পারত। আর তাছাড়া আজকে রাতের মতো ওকে আশ্রয় দিলেই পারতে। বাইরে এত জলঝড়-এর মধ্যে কোথায় গেল মেয়েটা!

—ওকে আশ্রয় দেব? তুমি কি পাগল হলে? ও বলে কি জানো?

—কি বলে? উদ্বিগ্ন করুণা।

—বলে ওকে আশ্রয় দেওয়া মানে নাকি খোকার সৃষ্টিকে, আমার উত্তর-পুরুষকে আশ্রয় দেওয়া। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। খোকার নাম জড়িয়ে এমন ইতর ইঙ্গিত করতে পারে কোন ভদ্রলোকের মেয়ে? তাও আমার মুখের উপর? রাগে গরগর করতে থাকেন মহাদেববাবু। ভারী মুখখানা তাঁর অস্বাভাবিক রক্তাভ লাগে।

করুণা বিষণ্ণ হন। কি যেন ভাবেন একটু। অন্ধকারে হঠাৎ আলোর দিশা পান। —ও যা বলল তাতো সত্যিও হতে পারে।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন মহাদেববাবু। তুমিও একথা বলছ!

—খোকার সঙ্গে ওর তো অনেক দিনের ভাব। লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের দেখাও হত মাঝে মাঝে। তাই কিসে কি হয় কে জানে!

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়েন মহাদেববাবু। চশমাটা চোখে পরে নেন। বিহ্বল দৃষ্টি মেলে করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে মুখটা তাঁর করুণ হয়ে ওঠে। তারপর ছুটে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যান।

করুণা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন! দরজার কাছ থেকে চিৎকার করেন—তুমি কোথায় যাচ্ছ এই দুর্যোগের মধ্যে!

বজ্র আর বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিলে দূর থেকে মহাদেববাবুর গলা শোনা যায়, তাকে ফিরিয়ে আনতে।

# ফিরে দেখা

ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে মক্কেলের নথিপত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল বিবেক—বিবেক জ্যোতি প্রসাদ—মুঙ্গের বার-এর উঠতি ল'ইয়ার। বয়স কম হলে কি হয় এর মধ্যেই বেশ নাম করে ফেলেছে। আর মামলাবাজেরা ওর চারপাশে উড়তে লেগেছে। বেশ বড় বড় কতকগুলো মামলা ওর হাতে এখন। তার মধ্যে সুরজগাড়ার দারোগা খুনের মামলাটাও আছে।

ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনটা বাজতেই থাকে। বিরক্ত হয় বিবেক। এক্ষুণি মক্কেলদের আসা শুরু হবে। তাদের সঙ্গে অনেক শলাপরামর্শ আছে। আছে নানারকম আলোচনা আর দলিলপত্র পরীক্ষা। নথি সাজানো। এত সকালে নিশ্চয়ই কোনো মক্কেল খবর করছে। এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। না। মক্কেল হল লক্ষ্মী। এটা ভাবতেই বিরক্তি প্রসন্নতায় পরিণত হয়। টেলিফোনের আওয়াজ কিন্তু বন্ধ হয় না। বাঁ হাত বাড়িয়ে আলতো ভাবে রিসিভারটা তুলে নেয় বিবেক। চোখ আর মন দুটোই থাকে নথির পাতাগুলোর মধ্যে।

—হ্যালো! অন্যমনস্কভাবে বিবেক সাড়া দেয়।

—বিবেকদা বোল রহে হ্যাঁয়?

—হাঁ।

—আমি বিজিত।

—কৌন?

—আমি বিজিত। করবীর ভাই।

—আরে বিজিত! ক্যা সমাচার? কাঁহাসে বোল রহে হো?

—ঘরসে। আপনার সঙ্গে দিদি কথা বলবে।

—কৌন? নিজের কানটাকে ঠিক বিশ্বাস করে না বিবেক।

—দিদি।

—করবী? উও কব আয়ী?

—কাল এসেছে। নিন কথা বলুন।

কয়েক মুহূর্ত টেলিফোন হাতে বসে থাকে বিবেক। কোনো কথা বলতে পারে না। করবী! করবী মুখার্জী! সেই মেয়েটা যে খুব ভালো

গান গাইত ! ফর্সা রং, গোল মুখ, খানিকটা নেপালী ধরনের। চোখ দুটো খুব বড় বড় ছিল করবীর। দু চোখ মেলে যখন তাকাত তখন মনে হত মরে যাই আর কি ! সেই মেয়েটাই ওকে ডাকছে !

—হ্যালো। দূরভাষে সুরেলা কণ্ঠ কানে আসে। বিবেক বোল রহে হো ?

বোল রহে হো ! বলছ ! বলছেন না ! বিবেকের কান দুটোতে সাঁ সাঁ আওয়াজ হচ্ছে। সে যেন নিজের কর্ণেন্দ্রিয়র উপর আস্থা রাখতে পারছে না। করবী তাকে তুমি বলে সম্বোধন করছে ! আগে কেন এমন ভাবে ডাকোনি করবী ! তখন যে এই সম্বোধনটুকুর জন্য সে সব কিছু করতে পারত !

—হ্যালো। মিষ্টি গলা আবার কানে আসতে সন্ত্রস্ত হয় বিবেক।

—হ্যায় বিবেক বোল রহা হুঁ।

—আমি করবী। মনে আছে আমাকে ?

—কর্‌বী ! আপ্‌ তুমকো ইয়াদ কিউ নহী রহে গা ? কব আয়ী ? বিবেক ধাতস্থ হয়ে এসেছে অনেকটা।

—কাল এসেছি।

—আচ্ছা। সব ভালো তো ?

—হ্যাঁ। ভালোই আছি। তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত ?

—এই একটু। তেমন কিছু না। কেন বলত ?

—আজ বিকেলে আমাদের বাড়ি আসবে ?

—তোমাদের বাড়ি ? হঠাৎ ? কী ব্যাপার ? কিছু অকেসান আছে নাকি ?

—না, না। এমনিই। অনেকদিন আমাদের দেখা হয়নি। তাই জাস্ট একটু দেখা হওয়া। এখানে বীণাও এসেছে। কাল রাত থেকে আমাদের বাড়িতেই আছে।

—কে ?

—বীণা।

—বীণা মিশির !

—অভি মিশির নহি ! বীণা তিওয়ারী।

—হা হাঁ। বীণা তিওয়ারী। কসুর মাফ করে দাও।

বীণা ! আর ভাবতে পারছে না বিবেক। দীর্ঘাঙ্গী, চটুল, তন্বী একটি মেয়ে ওর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সেই বীণা ! ওর সহপাঠিনী ! ওর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়াটাও একসময় তার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ একটা কাজ ছিল। কলেজ ছাড়ার পরও আড়ালে আবডালে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে প্রায়ই। সতর্ক সহস্র নগরবাসীর চোখ এড়িয়ে ওরা লুকোচুরি

খেলেছে রঙের ঝর্ণায়। নানা ছুতোয় ওদের বাড়িতে গেছেও বেশ কবার। চিঠি চালাচালির সংখ্যাটা এখন আর বিবেকের মনে পড়ে না। ভালো করে যোগ দিলে পঞ্চাশ-ষাট তো হবেই।

হঠাৎই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে বিবেক জ্যোতির। না. ওরা সব হারিয়ে গেছে। করবী আর বীণার দল। কলেজ ছাড়ার পরই আস্তে আস্তে হারিয়ে গেছে এরা মরুভূমির ধু ধু বালিরাশির মধ্যে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বিস্মৃতির অতলে এরা হারায়নি। হারাবে না কোনোদিনও। এরা আছে স্মৃতির মণিকোঠায় লুকানো মানিকের মত।

—ক্যা আইয়ে গা না ! করবীর গলা শোনা যায় আবার।

—জরুর আউঙ্গা। শা-্কো বাদ।

—জাদা দের নহী হো। ছটার মধ্যেই আসা চাই। বীণা চলে যাবে সন্ধ্যার একটু পরেই। রাত এগারোটার গাড়ীতে ওর এলাহাবাদ যাবার কথা। ওখান থেকে আবার একদিন পরেই দিল্লী ! ভাবীকো সাথ মে লে আনা জরুর। করবী এক নাগাড়ে বলে যায়।

সাবিত্রী চায়ের পেয়ালা হাতে এসেছিল। টেবিলের উপর পেয়ালা নামিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। টেলিফোনের কথাগুলির কিছু কিছু ওর কানে গিয়েছে। ওর দিকে একবার তাকায় বিবেক জ্যোতি। একটু হাসে।

—ঠিক হ্যায়। হম্‌লোগ ছে'কা পহলেই পৌহুঁছ জায়েঙ্গে।

—বীণাকী সাথ বাত কিজিয়ে।

—হ্যালো।

—বীণার গলা কানে আসে। —ম্যায় বীণা।

—ম্যায় বিবেক।

চুপচাপ। দুজনেই হঠাৎ বোবা হয়ে যায়। কত কথা বলার ছিল। না। কিছুই বলা হবে না। অথবা অনেক কথা ওরা বলে. নেয়।

—আ রহে হ্যাঁয় না ?

—জরুর আউঙ্গা।

আবার স্তব্ধতা। কারো কথা নেই। বিবেক তাকায় সাবিত্রীর দিকে। কী ব্যাপার ! সাবিত্রীর চোখে জিজ্ঞাসা !

—ঔর ভাবীকো লে আনা।

—ঠিক হ্যায়।

জোর করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে বিবেক। সাবিত্রী তাকিয়ে আছে। ওর সামনে টেলিফোন হাতে চুপ করে বসে থাকাটা ভালো দেখাচ্ছে না। ওকি ভাবছে কে জানে ! চায়ের পেয়ালায় মুখ নামিয়ে আনে বিবেক। চুমুক দেয় অন্য মনে। ওর এখন পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভালো লাগছে। কিন্তু সে ভাবনার উপায় নেই। সাবিত্রী দাঁড়িয়ে। ওর চোখে মুখে হাজার প্রশ্ন।

—সাবিত্রী, আজ ছে বাজে আমরা যাবো এক জায়গায়।

—কোথায় ?

—আমার পুরনো বন্ধুদের সাথে মোলাকাত হবে আজ। ভুল বললাম। বান্ধবীদের সাথে দেখা হবে। একসঙ্গে পড়তাম সব আমরা।

—তোমার সেই বীণা, করবী, রমা, বিন্দু এইসব সখীরা ? টেলিফোনের ধরন দেখে ঐ রকমই মনে হচ্ছিল। সাবিত্রীর ঠোঁটে বিদ্রুপের বাঁকা হাসি।

—হ্যাঁ, ওদের দুজন করবী আর বীণা আমায় ডেকেছে। তোমাকেও নিয়ে যেতে বলেছে। তুমি তৈরী থেকো। সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই আমি কোর্ট থেকে ফিরে আসব।

—আমার আবার যাবার কী আছে ! তুমি যেও। তোমার বান্ধবীদের সঙ্গে পুরনো প্যার—মোহাব্বতের পালাটা ঝালিয়ে নিও।

—অবুঝ হয়ো না লক্ষ্মীটি। তুমি না গেলে ওরা হাসবে। তাছাড়া তোমার সঙ্গে তো ওদের পরিচয়ও হয়নি কোনোদিন।

—বলে দেবে শরীর খারাপ।

—এখন আর ওকথা বলা যায় না। তাছাড়া তুমি যাবে নাই বা কেন ? চল, দেখো তোমারও ভালো লাগবে।

—আমি গেলে তোমার মোহব্বতের অসুবিধা হবে না ?

—কভী নহী। আমার প্যার-মোহব্বত তো আমার ঘরেই বাঁধা।

—খোসামোদী হচ্ছে ? বহুত চালু আছো তুমি।

পৌনে ছ'টায় সাবিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিবেক এলো করবীদের বাড়ি।

—এসো, এসো বিবেক। আইয়ে ভাবিজী। সাদর অভ্যর্থনা জানায় করবী।

পর্দা ঢাকা বাইরের ঘরে উজ্জ্বল আলো। সে আলোয় বিবেক মুখ তুলে তাকায়। করবীর চোখে চোখ পড়ে। সেই চোখ। এ চোখের দৃষ্টি কাড়ার জন্য কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করেছে সে আর তার বন্ধুরা। সামান্য হাসি ওর ঠোঁটে ফুটে ওঠে ! মনে পড়তে থাকে পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। সে দিনগুলো কি বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেছে !

—নমস্তে।

—নমস্তে।

বিবেক সামনে তাকায়। বীণা এসে দাঁড়িয়েছে।

সোফায় বসতে বসতে বিবেকের মুখের রং পাল্টাতে থাকে খুব তাড়াতাড়ি। একি বীণা ! কোথায় সেই বীণা ! তার মানসী প্রিয়া, কল্পলোকের রাজকন্যা বীণা মিশ্র ! এ কে ! এ কে সামনে হাসবার ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে আছে ! এতো তার বীণা নয়। অন্য কেউ। অন্য নারী। অন্য জন। হঠাৎ দুঃসহ একটা দুঃখের কটু তিক্ত স্বাদ বিবেকের সারা মুখটা

তেতো করে তোলে। তার বারবার মনে হতে থাকে একটি কথা। একী সেই কন্যা যার জন্য সে একরকম পাগল হয়ে গেছিল! এরই জন্য কি পিতৃ সম্পত্তির সকল মায়া ত্যাগ করতেও সে তৈরি ছিল সেদিন! না। না। না। করবী ঝুট বলেছে। অন্য মেয়েকে বীণা সাজিয়ে ওর সঙ্গে চতুরালী করেছে।

কয়েক মুহূর্ত। কয়েক ঘণ্টার মত দীর্ঘ। আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নেয় বিবেক। ও বিবেক নয়, ও আর ডি অ্যান্ড ডি জে কলেজের ছাত্র নয়। ও মুঙ্গের বার-এর উঠতি ল-ইয়ার, ক্রিমিনাল কেসের দুর্ধর্ষ অ্যাডভোকেট বি. জে প্রসাদ যে প্রতিকূল অবস্থাতেও হার মানে না। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখ থেকে সে মামলা জিতে নিতে জানে।

এরপর নানা কথা। আর ডি. ডি জে কলেজের সহপাঠী-সহপাঠিনীদের কথা। কে কোথায় আছে, কী করছে তার খবরাখবর। কার কটা ছেলে-মেয়ে তার হিসাব। প্রফেসরদের কথা, ছোট্ট ছোট্ট সামান্য সামান্য ঘটনা যেগুলো এখন দুর্লভ মনে হয় তার পুনরাবৃত্তি। হ্যাঁ, ওদের আবার দেখা আট বছর পরে। পাক্কা আট বছর। আট বছর পরে ড্রইংরুমে ওরা আবার ফিরিয়ে আনতে চাইল রাজা দেওকী নন্দন অ্যান্ড ডায়মণ্ড জুবিলি কলেজের দিনগুলোকে।

কথা বলতে বলতেই বিবেক বুঝতে পারে ওদের আলোচনার প্রসঙ্গ পাল্টাচ্ছে। ক্লাশের কথা, বন্ধুদের কথা, নানা ছেলেমানুষীর বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে উইংসের আড়ালে চলে যাচ্ছে। তার জায়গায় চলে আসছে বর্তমানের নানা হিসেব-নিকেশ। রাজা দেওকী নন্দন অ্যান্ড ডায়মণ্ড জুবিলী কলেজের উচ্ছল ছাত্রীরা হঠাৎই যেন মেকআপ নিয়ে স্টেজে এসে হাজির হয়েছে। ওদের এখন নতুন ভূমিকা। করবী হয়েছে মিসেস ব্যানার্জী—ইণ্ডিয়ান অয়েলের মার্কেটিং ম্যানেজারের দেমাকী স্ত্রী। তার চেহারা সুখী সুখী। ভরন্ত শরীরে প্রাচুর্যের ছাপ। এ করবীর গলায় সেদিনের গান যেন আর নেই। তানপুরা বিদায় নিয়েছে বহুদিন। এ করবী সময় কাটায় পার্টিতে গিয়ে, মহিলা সমিতি করে আর অলসভাবে ফিল্ম জার্নালের পাতা উল্টে।

এককালের বীণা মিশ্রও তার তন্বী তরঙ্গিনী চেহারা চমৎকার মেকআপের গুণে কেমন বদলে ফেলেছে। এখন ও হয়েছে মিসেস বীণা তিওয়ারী। মিঃ প্রমোদ তিওয়ারী আই, এ. এসের মেমসাহেব। মেকআপে কি শরীরে মেদের পরিমাণ এতখানি বাড়ানো যায়! যায় বোধহয়। মুখের চামড়ায়, চোখের কোলে নিখুঁত মেকআপের জোরে দ্রাক্ষারসাসক্তির চিহ্ন প্রকট করেছে। চোখের চঞ্চল দৃষ্টি কী করে হারাল ও! সেখানে কেমন আত্মতুষ্টি আর পদমর্যাদার প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ফুটিয়ে ফেলেছে!

বিবেক চুপ করে দেখে। দেখে আর ভাবে। সাবিত্রীও কেমন প্রতিষ্ঠিত

আইনজীবীর গরবিনী বধূ হয়ে এদের সঙ্গে একই মঞ্চে নিজেকে চমৎকার ভাবে মানিয়ে নিয়েছে ! ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু চলতি টি. ভি. সিরিয়াল, নতুন রিলিজ করা ফিল্মের নায়ক-নায়িকা, স্বামী সৌভাগ্যের প্রচ্ছন্ন অহমিকা জড়ানো টুকরো-টাকরা কথা, নতুন ডিজাইনের শাড়ি-গয়না আর দেশী-বিদেশী নানা পারফিউমের গুণাগুণ। ওরা সবাই কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল। স্বাচ্ছল্য আর আধুনিকতার দৌড়ে পাল্লা দিচ্ছে নিজেদের মধ্যে। বিবেকের একটুও ভালো লাগে না।

সাবিত্রীই বা এত কথা বলছে কেন ! এখানে তো আসতেই চাইছিল না। এখানে আসার কথায় কী ঠোঁট বাঁকানো আর শ্লেষের হাসি। তবে এটা মন্দের ভালো। বিবেক আশ্বস্ত হয়। ঘরে ফিরে বাঁকা বাঁকা কথা বেশি শুনতে হবে না। কিন্তু ও এতো নিশ্চিন্তে এদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কথা বলছে কী করে ! স্বামীর একদা সহচরীদের হাস্যোচ্ছল কথাবার্তা শুনে একটুও কী রাগ হচ্ছে না ওর ! একটু ঈর্ষা ! অসূয়া ! অদ্ভুত মনে হয় বিবেকের।

সাবিত্রী করবীর সঙ্গে মডেল হওয়ার রহস্য নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা করছে। গভীর ভাবে সে আলোচনায় অংশ নিচ্ছে বীণাও। এরা সবাই সুখী সুখী জীবন কাটাচ্ছে। নিজের নিজের অধিকারের ক্ষেত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। বুঝে গেছে নতুন করে হারাবার আর এদের কিছু নেই। ক্ষমতা আর অর্থ ওদের হাতের মুঠোয়।

কি একটা প্রসঙ্গে করবীর সঙ্গে উঠে যায় সাবিত্রী। বসে থাকে বীণা আর বিবেক। মুখোমুখি। দুজনের চোখে চোখ পড়ে। কিছু কি খোঁজে ওরা !

—বীণা। বিবেক ডাকে।

—বল। বীণা রহস্যমাখা দৃষ্টি মেলে বিবেকের মুখে।

—তোমার সঙ্গে কতদিন পরে দেখা !

—অনেক দিন হল।

—কতদিন হল বলত ?

— প্রায় সাত বছর।

—তোমার মনে পড়ে না সেই ছেলেমানুষীর দিনগুলো ?

ঘাড় ঝাঁকায় বীণা। আছে আছে সব মনে আছে ! এসব কথা কী ভোলার ! বুড়োমানুষী যত আসর জমাবে ছেলেমানুষীর কথাগুলো ততই যে গভীরভাবে মর্মমূলে আশ্রয় নেবে।

—তুমি তো এখন খুব সুখী !

—তুমিও তো। অত সুন্দরী বৌ তোমার।

—আমরা দুজনেই সুখী মানুষ। হয়ত আমরা খুব দুঃখী হতে পারতাম।

—হয়ত বা। বীণা মাথা নীচু করে।

—তুমি জিতেছ না হেরেছ ? বিবেক প্রশ্নটা করে অস্বস্তি বোধ করে।

চুপ করে থাকে বীণা। আঙ্গুলের নেল পালিশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

—উত্তর দাও। ওরা এসে পড়বে এখুনি। বিবেক তাগিদ দেয়।

—আগে মনে হতো জিতেছি।

—এখন ?

—আজ এখন, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে হেরে গেছি। বীণার মুখ হঠাৎই করুণ লাগে।

—এ কথা কেন মনে হচ্ছে ? বিবেক অবাক।

— কেন জানো ? তুমি, আমি, করবী, রুমা, বিন্দু, বাবুরাম সবাই আমরা একসঙ্গে শুরু করেছি। চলেছিও একসঙ্গে। তখন তোমাকে আমরা কোনো কোনো সময় হয়ত বা ছাড়িয়েও যেতাম। আর আজ ? বয়স যদিও আমাদের সবারই কাছাকাছি, কিন্তু তোমার জগৎটা আলাদা হয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। আরো বড় হবে হয়ত। শাদী করে, সংসারী হয়ে আমরা কিন্তু খুব ছোট গণ্ডিতে এসে আটকে গেছি। গণ্ডিটা হয়ত বা দিন দিন আরো ছোট হবে।

—আমিও তো সংসারী। শাদী করেছি।

—না, বিবেক না। শাদী করলেও তোমার জগৎ সেখানেই আটকে নেই। তোমার বৌ, ছেলে মেয়ের বাইরে তোমার বৃত্ত বাড়তেই থাকবে। আমাদের কিন্তু কোনোদিনও বাড়বে না।

বিবেক কী বলতে যাচ্ছিল। বলা হল না। করবী আর সাবিত্রী ঘরে ঢোকে। শুরু হয়ে যায় ঠাট্টা তামাশা। মেয়েলি আলাপ। হঠাৎ হঠাৎ হৈ চৈ। ত্রিশ আর বাইশে কোনো পার্থক্য থাকে না।

বিবেকের বলার কিছু নেই আর। চুপ করে বসে থাকে ও। করবী, বীণা আর সাবিত্রী গল্প করে চলে। বিবেকের দিকে কারো নজর নেই। আর. ডি. ডি. জে. কলেজের প্রাঙ্গণ আর মুঙ্গের শহরের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে ওদের কথা অনেক অনেক দূর এগিয়ে যায়। ভিডিও, কুলার, ছেলেমেয়ের এডুকেশন হয়ে চলন্তি ছবির দামী নক্ষত্রদের ধরতে যায় ওদের গল্প। ঘূর্ণায়মান পাখাটার দিকে তাকিয়ে বিবেক একটা সিগারেট ধরায়। ওর আর ভালো লাগছিল না গৃহিণীদের এই আসর। সে বুঝতে পারছিল অতীত বিদায় নিয়েছে। এবং চিরতরে। আর. ডি. ডি. জে. কলেজের তিনটি প্রাক্তন সহপাঠী-সহপাঠিনীদের জায়গা দখল করে নিয়েছে তিন গৃহিণী—মিসেস ব্যানার্জী, মিসেস তেওয়ারী এবং মিসেস প্রসাদ।

নিঃশব্দে বিবেক উঠে বাইরে দাঁড়ায়। ওর বারবার মনে হয় ওদের এই দেখাটা না হলেই হয়ত ভালো ছিল।

# রিক্ত মৌসুমী

সুচরিতাসু,

প্রথমেই ক্ষমা চাইছি এ চিঠি লেখার জন্য। এটা পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হবে। হবারই কথা। তোমাকে তো বহুদিন আমি চিঠি দিইনি। কতদিন হবে! প্রায় তিন বছর হল, তাই নয়? আমি ভুল বলছি। দু বছরের কিছু বেশি হল। শেষ চিঠি দিয়েছিলাম তোমাকে এখানে আসতে বারণ করে। আর আমাদের দেখা হয়নি কতদিন? হ্যাঁ, তিন বছর হল ঠিক। শেষ দেখা হয়েছিল কলকাতায় তোমাদের বাড়িতেই। তারপরই তো তুমি চাকরী নিয়ে চলে গেলে রায়গঞ্জ।

পাতা ঝরার দিন এসেছে আবার। ডালে ডালে ঝরে পড়ার কান্না। ধূসর নীল আকাশে সর্বস্বান্ত ঋতুর হাহাকার। মনটা উদাস হয়ে যায়। হঠাৎই মূক বেদনা মুখর হতে চায়। তাই এ চিঠি।

আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাটা এখনও ঝুলে আছে কোর্টে। মামলাটা অবশ্য আমিই এনেছি কিছুদিন আগে। তোমাকে নোটিস করা হলেও তুমি সাড়া দাওনি। অর্থাৎ মামলা তুমি লড়বে না। আমাকে একতরফা জিতিয়ে দিতে চাও। এ মামলা আনারও কোনো দরকার ছিল না আমার। তুমিতো আমাকে মুক্তিই দিয়ে গেছ। কিন্তু এ কেমন মুক্তি আমায় দিয়েছ যা শুধু বন্ধনকেই বাড়িয়ে তুলছে!

অবাক হচ্ছ খুব বুঝতে পারছি। ভাবছ ভূতের মুখে রামনাম কেন! তোমার কোন বন্ধনকেই তো আমি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিনি। প্রথম প্রথম তুমি জোর খাটাতে। নিজের অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে চাইতে। একচুল ভাগও কাউকে দিতে চাওনি কোনোদিন। তারপর আমাকে ভূতে পেল। ভূত নয়, পেত্নীতে। ওঝা ডাকার কসুর তুমি কম করনি, কিন্তু পেত্নীর কুহকে যখন আমি অন্ধ তখন তুমি হাল ছেড়ে দিয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছ। আমার মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা যেদিন তুমি একবস্ত্রে আমাদের রাসবিহারীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলে।

আগের দিন সন্ধ্যা থেকে আমি বোধহয় খানিকটা বেশি মদ গিলেছিলাম। ফিরেছিলাম অনেক রাতে। সম্ভবত খুব জোরে জোরে কড়া নেড়েছিলাম আমি। তুমি দরজা খুলে সরে দাঁড়ালে। আমি ভিতরে ঢুকলাম স্খলিত চরণে। তোমায় পাশ কাটিয়ে আমি উপরে উঠতে যাচ্ছিলাম, তুমি সিঁড়ির মুখে পথ আগলে দাঁড়ালে।

'আজও রাত্রে মদ খেয়ে বাড়ি এসেছ!' তোমার দুচোখে অশনিসঙ্কেত। কপালে ভ্রূকুটি।

হঠাৎই আমার রাগ হল। 'বেশ করেছি, তাতে তোমার কি? আরো খাবো। যত ইচ্ছে খাবো।' আমার উদ্ধত উত্তর।

'লজ্জা করে না ভদ্রলোকের বাড়িতে মাতাল হয়ে এতরাত্রে ফিরতে?' তোমার তীক্ষ্ণ শ্লেষাঘাত।

'কার বাড়ি! ভদ্রলোকের! কে ভদ্রলোক? তুমি না আমি?' জড়িত স্বরে কথা বললেও আমার নেশা ছুটে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে।

'তুমি ভদ্রলোক হলে মদ খেয়ে এতরাতে বাড়ি ফিরে আবার স্ত্রীকে মেজাজ দেখাতে না।'

তোমার শানিত চাবুক আমার মাথায় আগুন ধরালো। 'What! আমি ভদ্রলোক নই! আমি মাতাল! যা মুখে আসছে তাই বলছ যে! আর ইস্ত্রী? কে ইস্ত্রী? তুমি! বাঁজা মেয়ে আবার স্ত্রী হয় নাকি! হাঃ হাঃ হাঃ!' আমি অট্টহাস্য করে উঠলাম।

জোঁকের মুখে যেন চুন পড়ল। তুমি দু'কানে হাত দিয়ে ওখানেই বসে পড়লে। তোমার চোখদুটো সে সময় নিশ্চয়ই সব দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছিল। হয়তো দু ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়েছিল তোমার দু'গালে। আমি সেদিকে দৃক্‌পাত করিনি। বীরদর্পে রেলিংএ ভর দিয়ে উপরে উঠে গেলাম।

সে রাতে তুমি বোধহয় আর ঘরে আসনি। সিঁড়ির উপর রাত কাটিয়েছিলে কিনা কে জানে! আমার শুধু মনে আছে জুতো জামা না ছেড়েই নরম বিছানাটার উপর এলিয়ে পড়েছিলাম আমি। তারপর রাত কখন পোহালো জানি না।

পরের দিন যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা। আগে রোজ তুমি গরম চা হাতে আমায় ডেকে তুলতে। ইদানীং আর ডাকতে না। সেদিনও ডাকনি। আমি চায়ের জন্য চাকরটাকে ডাকলাম। কেউ সাড়া দিল না। ঘুম থেকে উঠেই চা না পেলে আমার বরাবরই রাগ হত। এখনও হয়। আর শুধু তুমিই জানতে সে কথা। তোমার উপরই তাই মনটা বিরূপ হল।

চটি পায়ে গলিয়ে নীচে নেমে এলাম। সিঁড়ি থেকেই দেখতে পেলাম তুমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে লাল্টের সঙ্গে কথা বলছ। লাল্টে আমাদের পাড়ার নম্বরী মাস্তান। তোমার সঙ্গে ও খুব হেসে হেসে গল্প করছে। আমি কথা না বলে শুধু কাশলাম। তুমি ঘাড় ঘুরিয়ে আমায় দেখলে কিন্তু গ্রাহ্য করলে না। যেমন কথা বলছিলে তেমনিই বলে চললে। বরং আরো বেশি উচ্ছ্বসিত মনে হল তোমাকে। আমার মাথায় আগুন চড়লেও আমি উপরে উঠে এলাম। রাগে গরগর করতে লাগলাম শুধু। লাল্টের জন্য তোমায় কিছু বলতে পারলাম না। পাড়ার এক নম্বর গুণ্ডাও। কথায় কথায় ছুরি চালায়, বোমা মারে। ওকে ঘাঁটাবার সাহস আমার নেই। কিন্তু

ওর সঙ্গে হঠাৎ এই হাসাহাসি তোমার সম্বন্ধে একটি বিশ্রী সন্দেহে আমাকে বিদ্ধ করল। ছিঃ ছিঃ, শেষকালে লাল্টের মত ছুঁচো একটা লোকের সঙ্গে ভাব ভালবাসা!

উপরের ঘরে ফিরে এলাম। ড্রয়ার থেকে বার করলাম সযত্নে মোড়া শিপ্রার চিঠিটি। বার বার পড়লাম সেটা। ওর ফটোটা বার করে সামনে টেবিলের উপর রাখলাম। খানিকটা সান্ত্বনা পেলাম। সঙ্গে একরাশ হতাশা। কারণ, শিপ্রা বলেছে অন্য বৌ ঘরে থাকতে ও কোনমতেই আমাকে বিয়ে করতে পারবে না। আইনে আটকাবে। কিন্তু শিপ্রাকে যে আমার চাইই। ওকে না পেলে আমার জীবনটা বরাবরের মত মরুভূমি থেকে যাবে। যা তুমি আমাকে দাওনি, দিতে পারবে না কোনোদিন, শিপ্রা আমাকে তাই দেবে। ও কথা দিয়েছে। কিন্তু তুমি থাকলে তো তা হবার নয়!

এমন সময় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তুমি ঘরে ঢুকলে। আমি স্পষ্ট দেখলাম তোমার মুখের সব আলো এক নিমেষে নিভে গেল। তোমার চোখে পড়েছে শিপ্রার ছবিটা। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে তুমি চলে যাচ্ছিলে। আমি ধরে ফেল্লাম। তোমার উপর আমার অকারণেই ভীষণ রাগ হল। খানিক আগে লাল্টের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলাটা মনে পড়ল।

'বোস।' খুব গম্ভীর গলা আমার।

'কেন?'

'তোমায় একটা কথা বলতে চাই।'

'কি কথা?'

আমি একটু দ্বিধা করলাম। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। 'তুমি আমাকে মুক্তি দাও। আমি আর পারছি না।'

তোমার মুখটা কি সাদা হয়ে গিয়েছিল! সারা দেহ কি কাঁপছিল! মনে নেই আজ। তুমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলে। তারপর বললে, 'মুক্তি! কেন? আমি মুক্তি দেবার কে? তুমি তো মুক্তই। তোমায় তো আমি ধরে রাখিনি।' তোমার কথার মধ্যে বাষ্প ছিল বোধ হয়। আমি লক্ষ্য করতে চাইলাম না।

'আইনের চোখে আমি মুক্ত নই। কিন্তু সত্যিই আমি হাঁপিয়ে পড়েছি। আমি তোমাকে আর স্ট্যান্ড করতে পারছি না।' আমার কথাগুলো খুব নির্দয় ছিল। একটু বোধহয় বেদনা মেশানোও ছিল।

'আমাকে কি করতে হবে?' তোমার প্রশ্নে জ্বালা ছিল।

'ডিভোর্সে সম্মতি দাও। প্লিজ, দয়া করো। এ প্রহসন শেষ হোক্।' আমি কি করে এ কথা বলেছিলাম আজ কিছুতেই মনে করতে পারছি না। তোমাকে কে যেন আচমকা চাবুক দিয়ে মারল। বেদনায় তুমি নীল হয়ে গিয়েছিলে কিনা এখন আর মনে পড়ছে না। কিছুক্ষণ চুপ

করে দাঁড়িয়ে থাকলে। তারপর শুধু বললে একটি কথা অনেক কষ্টে। 'তুমি মুক্ত। কাগজ যা দেবে সই করে দেব!'

তুমি আর দাঁড়ালে না। টলতে টলতে বেরিয়ে গেলে। আমার ভিতরটাও কেমন যেন মুচড়ে উঠল! আমিও আর পারলাম না। আলমারির লুকনো কোণ থেকে হুইস্কির বোতল বার করে নিলাম। পুরো বোতলটাই একসময় খালি হয়ে গেল। কিন্তু বিশ্বাস কর, রীতু, আমার বুকের সেই গুমুরানিটা একটুও কমল না তাতে।

অনেক বেলায় যখন আবার নীচে নামলাম, দেখলাম কেউ নেই। চাকরটা কি বাজার থেকে ফেরেনি এখনও! ঘড়ির দিকে তাকালাম। দুটো বেজে গেছে! সেকি! ব্যাটা আমাকে কেন এতক্ষন ডাকেনি! হয়ত ডেকেছিল।

খেয়াল হল চাকরটাকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি ক'দিন আগে। ভুল বললাম। তুমিই ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলে খরচ কমাবার জন্য। তোমার দোষ নেই কিছু। সংসার খরচের টাকা যে দিন দিন আমি কমিয়ে দিয়েছিলাম। হয়তো সে সময় মোটেই কিছু দিতাম না। কি ভাবে সংসার চালাতে তুমিই জান। আমি তো কোনদিকেই খেয়াল করতাম না কিছু। আর তোমাকে টাকা দিতামই বা কি করে! শিপ্রার খরচ, মদের খরচ— তারপর আমার হাতে কি কিছু থাকত! নীচে নেমে কাউকে দেখলাম না। সদর দরজাটা ভেজানো রয়েছে। বাইরের ঘরে উঁকি দিলাম। এ ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েই তুমি লালুটের সঙ্গে আলাপ করছিলে। সেণ্টার টেবিলের উপর একটা কাগজ দেখলাম অ্যাশট্রে চাপা দেওয়া। তোমার চিঠি। তুমি আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছ!

এরপরই আমি কিন্তু ডিভোর্সের মামলা সাজাইনি। তুমি চলে যাওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত আমার সব শূন্য মনে হয়েছে। অসহায় মনে হয়েছে নিজেকে! তোমার খোঁজ করেছিলাম। জানলাম তুমি রায়গঞ্জ চলে গেছ ওখানকার একটা গেঁয়ো স্কুলে চাকরি জুটিয়ে।

আইনের চোখে তোমার আমার যেটুকু সম্পর্ক ছিল তা দূর করবার আগে তোমাকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। সেই আমার শেষ চিঠি। দু বছর বাদে আবার চিঠি দিচ্ছি। কিন্তু সে চিঠি আর এ চিঠির মধ্যে অনেক পার্থক্য। ইতিমধ্যে গঙ্গায় কত জল বয়ে গেছে। কত পরিবর্তন হয়েছে জগৎটার! তাই আজ এতদিন পরে আমার এ চিঠি যদি ছিঁড়ে ফেল অথবা আদৌ না পড় তাতেও আমার অনুযোগ করার কিছু নেই। বরং সে-রকম না হওয়াটাই আশ্চর্যের হবে। তোমার উপর কোন দাবী আমার থাকতে পারে না। আমি মুক্তি চেয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে। তুমি আমাকে স দুর্লভ মুক্তি দিয়েছ।

আচ্ছা বল তো, এমন কেন হল! তোমাকে তো আমি ভালোবেসেই

বিয়ে করেছিলাম। তোমার মা-বাবার তো এ বিয়েতে বিশেষ মতও ছিল না। তবু আমাদের বিয়ে হয়েছিল। আমরা তো একদিন প্রেমের নিশান উড়িয়ে ছিলাম কত স্বপ্ন নিয়ে। তখন তো ক্ষণিকের জন্যও ভাবিনি আমাদের আকাশে ঝড়ের মেঘ জমবে! মনে পড়ছে সেই সুখের দিন গুলোর কথা যখন আমরা দুজন মেঘের ভেলায় চড়ে দ্যুলোক ভূলোক পাড়ি জমাতাম! কত চাঁদিনী রাতে আমরা হাত-ধরাধরি করে বেড়িয়েছি কত বর্ষার মেঘ-সজল দিনে আমরা গান গেয়েছি, ধারা জলে স্নান করেছি প্রাণের পুলকে। মুক্ত নভোঙ্গনে আমাদের বিহার ছিল, পৃথিবীর মাটিতে ঠাঁই নিতে চাইতাম না। তুমি মাঝে মাঝে চাইতে শ্যামল মাটির স্পর্শ কালো মাটির সংসার যেখানে কচি কণ্ঠে কলরোল উঠবে আমাদের জীবন ভরিয়ে দিতে। এতে আমার ঘোর আপত্তি ছিল। আমি বলতাম, 'না আরো কিছুদিন যাক। ছেলেমেয়ে হলেই তো আমাদের সব শেষ।'

'ও আবার কি কথা!' তুমি বলতে, 'বিশ্ব-সংসারে যেন কারো ছেলে মেয়ে হয় না! আর তখন কি তারা সবাই ফুরিয়ে যায়! শেষ হয়ে যায়?'

'ফুরিয়ে যায় কিনা জানিনা। তবে রাম-শ্যাম-যদু-মধুরই ছেলে-মেয়ে হয়। কিন্তু রীতু, আমাদেরদুজনের মাঝে তৃতীয় প্রাণী আসুক আমি চাই না! আমার মনে হয় তাহলে আমরা ফুরিয়ে যাব।'

'এ তুমি ঠিক বলছ না। বরং আমাদের মধ্যে স্বর্ণ-সেতু রচনা করবে আমাদের সন্তান। আমরা সম্পূর্ণ হব।' তুমি বোঝাতে।

আমি তোমার কথা মানতাম না। তোমার ইচ্ছাকে সম্মান দিতাম না জোর খাটিয়ে আমার ইচ্ছাকে তোমার উপর চাপাতাম। আমার মনে পড়ে একদিন তুমি আমার বুকে মাথা রেখে কেঁদে ফেলেছিলে। আমি কিন্তু অনড়। প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ নিল। কয়েক বছর বাদে আমার মধ্যে কি পরিবর্তন আসল। আমি চাইলাম তুমি মা হও। তোমার পুঞ্জীভূত অভিমান নিয়ে তুমি বললে, 'না'।

তবু একদিন সেই শুভদিন এল যেদিন তুমি অনেক আদরে সোহাগে আমাকে ভরিয়ে কানে কানে চুপি চুপি সেই খবর দিলে যা শুনে আমার সমস্ত দেহ মন নৃত্য করে উঠল। পলাশের রং লাগল তোমার গালে। তোমার সারা দেহে আমলকী পাতার নাচন লাগল। আমরা আবার নভশ্চর হলাম বন্ধন এত মধুর আগে কখনও বুঝিনি।

তোমাকে ডাক্তার চ্যাটার্জীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি পরীক্ষা করে বললেন সব ঠিক আছে। আমরা উল্কার মত উড়ে গেলাম পুরী সমুদ্র-সৈকতে। সাগর-তরঙ্গে প্রতিরাত্রে আমরা লক্ষ মানিক জ্বলার মত আমাদের কোরকের বিকাশ দেখলাম।

আবার যেদিন ডাক্তার চ্যাটার্জীর কাছে তোমায় নিয়ে গেলাম, সেদিন

জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ পেলাম আমরা। মনে আছে বোধহয় তোমার সব ঘটনা। ডাক্তার চ্যাটার্জী তোমায় ভালো করে পরীক্ষা করে মুখ কালো করলেন।

ভীষণ ভয় পেলাম। 'কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু ?'

'কফি খাবেন ?' ডাক্তার চ্যাটার্জীর গলাটা কেমন যেন লাগল। উত্তর এড়াতে চাইছেন।

'না। কেমন দেখলেন বলুন।'

'সরি মিঃ মজুমদার। আপনার স্ত্রী আদৌ কন্‌সিভ করেননি।'

আমি বিস্মিত হলাম। 'আপনি কি ঠাট্টা করছেন ডাক্তার চ্যাটার্জী ?'

'ঠাট্টা করতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু সত্যিই আপনার স্ত্রী কন্‌সিভ করেননি।'

'আপনি আগের বারে বললেন সব ঠিক আছে। তাছাড়া প্রেগ্‌ন্যান্সির সমস্ত লক্ষণই তো প্রকট !'

'ইয়েস মিঃ মজুমদার, আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু এটা একটা সুডোকনসেপসন্ মাত্র। এ ধরনের কেসে গর্ভের সমস্ত মূল লক্ষণগুলো প্রথম দিকে একই থাকে। তবে পরে বোঝা যায়।'

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সেদিন তোমাকে নিয়ে কি করে বাড়ি ফিরেছিলাম মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে আমি যেন একটা অন্য জগতে চলে গিয়েছিলাম যেখানে আলো নেই, গন্ধ নেই, বর্ণ নেই। অনেক কাঁটার উপর দিয়ে দীর্ঘ যাত্রা যেমন মরিয়া করে তোলে মানুষকে, আমিও যেন তেমন কিছু হয়ে গিয়েছিলাম। আরো তিন-চার জন গাইনো-কোলোজিস্টকে ডেকে তোমাকে পরীক্ষা করিয়েছিলাম। কিন্তু সকলেরই এক কথা—সুডোকন্‌সেপসন। ওঁরা বলেছিলেন আরো মারাত্মক কথা। তোমার নাকি সন্তান ধারণের অর্গানগুলো সব ড্যামেজড হয়ে গেছে। অর্থাৎ তুমি কোনদিনই আর মা হবে না।

তোমার চেহারা সে সময় আমি অনেকদিন দেখিনি সম্ভবত। তাই হঠাৎ চোখে পড়ল একদিন তোমার গালের পলাশের রং কখন মুছে গেছে। সাদা কাগজের মত হয়ে গেছে তোমার মুখ। তোমায় যখন বুকে টেনে অনেক মমতায় আদর করলাম তখন হয়তো আমার চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে তোমার মাথায় পড়েছিল। তুমি চমকে উঠে আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ছিলে। অস্পষ্ট গোঙানির মত আওয়াজে বার বার বলছিলে একটি কথা। 'সব আমার দোষ ! সব আমার দোষ !'

'তোমার দোষ কি ! এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। আমি প্রথমে চাইনি, তাই ভাগ্য আমাকে বঞ্চিত করল।'

'না গো না। এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।'

'পাপ ! কি পাপ তুমি আবার করলে ?'

'পাপ ! ওগো আমি অনেক পাপ করেছি। তুমি আমায় শাস্তি দাও।'

'ছেলেমানুষী কোর না রীতু ! পাপ আবার তুমি কি করবে ?'

'আমি কি সব খেয়েছিলাম বলেই তো এই অবস্থা হল !' তুমি ডুকরে উঠলে।

'কি খেয়েছিলে ?' আমি লাফিয়ে উঠি।

'সন্তান-ধারণ ক্ষমতা নষ্ট করার ওষুধ।' তোমার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠেছিল কিনা আমি দেখিনি। কিন্তু মুহূর্তে তোমার প্রতি ঘৃণায় আমার সারা শরীর রি রি করে উঠল।

'ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! তুমি না মায়ের জাত ! মায়ের জাত হয়ে তুমি সন্তান চাইলে না ? ওষুধ খেয়ে বন্ধ্যাত্ব ডেকে এনেছ !'

'কিন্তু, কিন্তু আমি ওসব খেয়েছিলাম তোমার জন্যই তো ! তুমি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলে !'

'আমার জন্য ! মিথ্যুক কোথাকার ! লজ্জা করে না মিথ্যা কথা বলতে ? আমি তোমাকে ওষুধ খেয়ে স্টেরাইল হতে বলেছিলাম ?' অসহ্য রাগে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল।

তুমি অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলে। কোন প্রতিবাদ করলে না। আমি যেন আরো ক্ষেপে গেলাম। তোমার দু কাঁধে হাত রেখে তোমাকে জোরে ঝাঁকুনি দিলাম। 'কথা বলছ না যে বড় ।'

'কি আর বলব ! তুমি ছেলে চাইতে না। আমি চাইতাম। সন্তানের জন্য তোমার কাছে মিনতি করেছি কত। তুমি নরম হওনি কোন দিন। আমি ভাবলাম, আমার ইচ্ছা বর্জন করলে তুমি খুশী হবে। তোমার মতোই আরো ভাবলাম সন্তান না হলে সারা জীবন তোমায় একান্ত করে পাব। তোমার যুক্তি যে ধীরে ধীরে মনে দাগ কেটে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। তাই সম্ভাবনার উপর না রেখে আমি খোদার উপর খোদকারী করতে চাইলাম। গাছ গাছড়া দিয়ে তৈরি ওষুধ খেলাম অনেক দিন ধরে গোপনে। কিন্তু বিশ্বাস কর, এ তো আমি সত্যিই মন থেকে কোন দিন চাইনি।' তুমি কেঁদে ফেললে।

তোমার সব কথা শোনার মত ধৈর্য আমার ছিল না। একটা অন্ধ বোবা রাগ আমাকে উন্মত্ত করে তুলল। তাই সে-দিন ঘর থেকে বেরিয়েই আমি বারে গেলাম। আর তারপর থেকেই মদ আমার বন্ধু হল।

এর কিছুদিন পরেই আলাপ হল শিপ্রার সঙ্গে। আমাদের অফিসেই ও কাজ করত। সুন্দরী, তন্বী, চটুল। আলাপ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হল। তোমার সঙ্গে নিত্য সংঘর্ষই বোধহয় এ জন্য দায়ী। তোমাকে আমি আর সহ্য করতে পারতাম না। তোমাকে মনে হত খুনী। আমার সন্তানকে যেন তুমি

নিজের হাতে গলা টিপে খুন করেছ। বাড়িতে তাই থাকতাম কত কম তুমি জান। মদ খেতাম খুব। তুমি প্রথম প্রথম কাঁদতে, ঝগড়া করতে, কটু কথা শোনাতে। আস্তে আস্তে তুমি কথা বন্ধ করলে। আমাকে শোধরাবার চেষ্টা তুমি অনেক করেছ—কিন্তু পারলে কই? তোমায় এড়াবার জন্যই যেন আমি শিপ্রাকে বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চাইলাম।

তুমি বোধহয় জানতে পেরেছিলে শিপ্রার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা। কিন্তু জানতে না ডায়মণ্ডহারবার টুরিস্ট লজে শিপ্রা আমাকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আমার বোবাকান্নায় সান্ত্বনা দিতে ও কথা দিয়েছিল আমার সন্তানের মা হবে। কিন্তু শর্ত করেছিল, ওকে আগে বিয়ে করতে হবে। আরো বলেছিল তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক মুছে ফেলতে হবে। আমি রাজী হয়েছিলাম। কিশলয়ের জন্য শীতের প্রহরে বনস্পতির কান্না তুমি শুনেছ কিনা জানি না। কিন্তু আমার মর্মে মর্মে, কোষে কোষে সেই কান্না অবিরত হাহাকার করত। বসন্তের পথ চেয়ে আমার সকল হৃদয় উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করত। তাই শিপ্রার আশ্বাসে আমি বসন্তের আগমনীর সুর শুনেছিলাম। আশ্বস্ত হয়েছিলাম। পথের কাঁটা দূর করতে তোমাকে বিসর্জন দিতে চেয়েছিলাম। তুমি যে আমার দুষ্টগ্রহ!

আজ সব কথা খোলাখুলি জানাতে আমার লজ্জা নেই। মান-অভিমান, আশা-নিরাশার বাইরে আমার জগৎ আজ নিঃস্ব। আত্মদহনের নির্মোকে আজ আমি অগ্নিশুদ্ধ। চিরাচরিত কামনা-বাসনার বাইরে আমি আজ দাবীহীন, অধিকারহীন এক অবাঞ্ছিত মানুষ। আমায় তুমি ক্ষমা কোরো না। আমি ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নই। বুকের আগুনে আমি অনুক্ষণ যে ভাবে দগ্ধ হচ্ছি তাতে কোন বোধই আমাকে সঙ্কোচে ফেলবে না।

তোমার সঙ্গে ডিভোর্স বোধহয় আমার সম্পূর্ণ হবে সামনের মাসেই। শিপ্রাকে বিয়ে করতে আমার বাধা থাকবে না। কিন্তু শিপ্রা আমাকে সত্যিই বিয়ে করবে কিনা জানি না। আজ কাল ও যেন আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়। আমায় দেখে ভয় পায় কেমন। ওর চোখের ভাষায় আমি আতঙ্ক দেখি। হয়তো এর কারণ প্রফেসর মিত্রের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব। হয়তো বা সবটাই আমার মনগড়া। আত্মপীড়নের সুধাপানের লোভে কল্পনার মিথ্যায়ন পুরো ব্যাপারটাই।

সত্য হোক, মিথ্যা হোক, আমার পক্ষে শিপ্রাকে কেন আর কাউকেই নতুন করে বিয়ে করা সম্ভব নয়। সব দিক দিয়ে আমার মত এত দেউলিয়া আর কেউ আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমার অকিঞ্চনতার বোঝা বাড়াতে জীবনে আর কাউকেই গ্রহণের কোন ইচ্ছেই আমার নেই। মনে-প্রাণে আমি নির্জীব যন্ত্রণার ইতিহাস হয়ে গেছি।

তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ হঠাৎ এমন কি হল যা আমার দেহে মনে অকিঞ্চনতার

বেদনা মিশিয়ে দিল। এতদিন উদ্দাম ভাবে কাটিয়ে হঠাৎ আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম কেন! বিষ-সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে আজ আমার কণ্ঠ আকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রিক্ততার যাত্রাপথে ব্যর্থপ্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে উঠতে পারিনি বলে আমি নিঃসঙ্কোচ।

জান রীতু, আজ সকালে খুব মেঘ করেছিল। সারা আকাশটা এত কালো হয়ে উঠেছিল যে মনে হয়েছিল সাত সাগরের জল যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে পৃথিবীটাকে। কিন্তু আশ্চর্য! এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল না। এক সময় একটা দমকা বাতাস সব মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন দূর প্রবাসে।

দুপুরের পর বসেছিলাম বাইরের বারান্দায়। সামনের ধান-কাটা মাঠ ছাড়িয়ে, রুক্ষ লাল পাথুরে মাটির বাধা কাটিয়ে, দিগন্তের ধোঁয়া ধোঁয়া হাল্কা নীলের মধ্যে সন্ধান করছিলাম বিস্মরণের মন্ত্রকে। এমন সময়ে সে এল ক্লান্ত মলিন চেহারা নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে। পরনে একটা সাদা-মাটা লালপাড় শাড়ি। গায়ে জামা নেই। বড় বড় খালি পা দুটো ধুলো ভর্তি। দু'হাতে শুধু দুটি শাঁখা। কালো চেহারায় আকর্ষণীয় কিছুই ছিল না শুধু শ্রান্ত মুখের লাবণ্যটুকু ছাড়া। সে বাগানের গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে এল অবসন্ন চেহারায়। অস্ফুটে কি বলল, বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বলছ?'

'কুড়িটা পয়সা খুঁজছি।'

'কেন? ঘর কোথা?'

'চাষ থানা। ভরদিন খাইনি কিছু। পয়সা পাল্যে মুড়ি খাবো।'

'চাষ থেকে এতদূর আসছ কেন?' আমার প্রশ্ন।

ও কিছু বলল না প্রথমে। বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল। থামে হেলান দিয়ে ওর মাথাটা রাখল। ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল ওর চোখ দিয়ে। বিব্রত বোধ করলাম। 'কি হল. কাঁদছ কেন?'

ও চুপ করে থাকল খানিক। চোখদুটো মুছে নিয়ে নিজেকে সংযত করে নিল। তারপর বলল, 'আমার স্বোয়ামী আমাকে তাড়ায় দিঁয়েছে।'

'কেন তাড়াল তোমার স্বামী?'

'উ ঘুরে বিহা করেঁছে। আমার স্বোয়ামী আর শ্বাশুড়ি আমাকে রোজ রোজ মারত। উ আজ ঘর থিকা বার করে দিলে!' মেয়েটি চোখ মোছে আবার।

'কেন, তোমার স্বামী আবার বিয়ে করল কেন?'

ও আবার চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। 'আমি উয়াকে ছেল্যা দিতে পারি নাই।' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল ও। 'ভগমান আমাকে মারলে। কোলে ছেল্যা থাকলে আমার এত দুখ্ হত নাই।'

আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। কি জিজ্ঞাসা করব! আমার সামনে

থেকে বহুদিনের ময়লা-জমা একটা কালো পর্দা যেন ধীরে ধীরে সরে গেল। প্রসন্ন দিনের আলোয় আমি দিগন্তকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম। আমার হঠাৎই নবজন্ম হল।

এখানেই আমার কথা শেষ। চিঠিও। অতীত বড় নির্মম—সে ক্ষমা করে না। স্মৃতির তুষানলে সে ধিকিয়ে ধিকিয়ে পোড়ায়। জানি, সারা জীবন আমাকে সে আগুনে পুড়তে হবে। তবু, কেন জানি না, তোমায় একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছে হল। লিখলাম। তুমি আমার অতীত। বিস্মরণে যখন হারিয়ে গেলে না তখন বর্তমান হয়ে দগ্ধ কর। ভবিষ্যতে আলো জ্বালাতে পার কিনা ভেবে দেখ! ইতি—তৃণাঞ্জন মজুমদার।

# বালিশ

হরবিলাসের বিছানাসক্তি প্রবল। বিছানা দেখলেই ওর মন আনচান্ করে। খুব ইচ্ছে হয় তার বিছানাটায় শোয়, আর শুয়েই গড়াগড়ি খায় উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম। বিছানা বিছানা করেই সে অস্থির। দিনরাত বিছানা আর বিছানা! বিছানাই যেন ওর জীবনের সর্বস্ব। তবে সব বিছানা দেখলেই ওর শুতে ইচ্ছা যায় না। অনেক বিছানা দেখে ওর বুক আতঙ্কের হিম হয়ে যায়, মনে হয় ওগুলো যেন শুধু শয্যা নয়, কণ্টক শয্যা। তা' ছাড়া সজ্জাহীন শয্যাকে ও সত্যি সত্যিই ঘৃণা করে; সেগুলোকে দেখলেই নাক সিঁটকোয়। কিন্তু যেগুলো বেশ পুরু গদীওয়ালা নরম বিছানা, উপরে ধপ্‌ধপে সাদা চাদর পাতা, সেগুলোও যে ভালো লাগবে এমন কথা হলফ করে বলা যায় না যদি না তাতে চড়ুয়ের বুকের মতো নরম কোমল সুন্দর একটি বালিশ থাকে। আসলে ওর মতে বিছানার মূল আকর্ষণই হল বালিশ। বালিশটাই যদি ভালো না হল, অর্থাৎ যদি বালিশটা মাথার মালিশের কাজ না করল, তাহলে আর বিছানাতে রইল কি! আর বিছানাই যদি ভালো না হয় তবে তো ঘুমের দফা গয়া। ঘুমটাই তো জীবনের সকল কামনার মধ্যমণি। শক্ত বালিশে মাথা রেখে সারারাত অনিদ্রায় ছট্‌ফট্ করার চেয়ে রেল-লাইনের উপর মাথা রাখা তার মতে অনেক ভালো। বিছানা এবং বালিশ সম্বন্ধে এমন মত যে পোষণ করে সেই হরবিলাসের বিছানা, বিশেষ করে বালিশটা, যে মনোহারী এবং নিদ্রাকর্ষক হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

বালিশটা যেন হরবিলাসের প্রাণ ভোমরা। অনেক স্নেহে যত্নে সে তাতে ওয়াড় পরায় একদিন অন্তর। মনোহর ও মোলায়েম বালিশের নরম ঢাকা পাল্টায় রোজ। মখমলে মোড়া, বড় উঁচু তার নরম বালিশটি যেন কাঁচা কিশোরীর ঢল্‌ঢলে মুখ। হাসিটি তাতে লেগেই আছে মিষ্টি ভাবে।

হরবিলাস আমার বন্ধু। খুব পুরনো বন্ধুও বলা চলে। ওর সঙ্গে পরিচয় সেই ছাত্র জীবনে। এখনো আমরা একই মেসের একই ঘরের বাসিন্দা। ওর আর আমার তক্তপোশ দুটিও কাছাকাছি পাতা। কাছাকাছি তক্তপোশ মানেই পাশাপাশি বিছানা। কিন্তু কাছাকাছি থাকলে কি হয়, বিছানা আর বালিশ নিয়েই হরবিলাসের সঙ্গে আমার হাজার সমুদ্রের ব্যবধান।

এ হেন হরবিলাস একদিন তার বিছানা আর বালিশের প্রতি বিতৃষ্ণ হল। সতৃষ্ণ চোখে সে আর কিছু খোঁজে। যেন সেটা না পেলে তার জীবন মিছে, অস্তিত্ব মিছে, পৃথিবী মিছে। বিছানার চাদর ময়লা হল, হরবিলাসের ভ্রূক্ষেপ

নেই। বালিশের ঢাকা চুঁইয়ে মাথার তেল শ্বেত শুভ্র ওয়াড় নষ্ট করতে লাগল, হরবিলাস নির্বিকার। আমি ওরই সামনে ওর বিছানায় শুতে আরম্ভ করলাম, হরবিলাস দেখেও দেখল না। অথচ আগে ওর বিছানা বালিশের কোথাও খুঁত থাকতে দিত না। আমি কখনও ওর বিছানায় বসতে গেলে ও হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসত। ব্যাপার কি জানার জন্য সচেষ্ট হলাম। ও হরি, এ যে দেখি সেই আদ্যিকালের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ হরবিলাস প্রেমে পড়েছে। আরো বিশদ করে বললে বলা যায় হরবিলাস প্রেমে পড়েছিল। কার সঙ্গে বলা কঠিন। তবে ভাবে বুঝলাম প্রেম মোটামুটি এক তরফা। আর সেটা হরবিলাসের দিকেই। তবুও হয়ত চলছিল মন্দ না। কিন্তু শ্রীমতী শীঘ্রই হরবিলাসের মায়া কাটাচ্ছেন। অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। হরবিলাসের সঙ্গে নয় অবশ্যই। আর কারো সঙ্গে। অন্য কোথাও।

বেচারা হরবিলাস! ওর জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। হতভাগাটা জানতেও পারেনি ঘুণাক্ষরে যে ও যখন ওর নরম বিছানায় নিজের মনোরম বালিশটির পাশে আর একটি অনুরূপ বালিশ রাখার স্বপ্ন দেখছে, তখনই ঠিক ওর নিঃসঙ্গ বালিশটির শ্রীহরণ করার চেষ্টা চলেছে। শ্রীমতীর ব্যবহারে হরবিলাসের মনোবিলাসে ব্যাঘাত তো ঘটেইছে উপরন্তু পরম স্নেহ ও আদরের বালিশটির ভাগ্যেও জুটছে সৎমা-সুলভ যত্ন। বালিশটি যেন হরবিলাসের মনের প্রতীতি: ওর মনের স্নিগ্ধতা দূরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালিশটিও যেন ক্রমশ রুক্ষ কঠোর হয়ে উঠতে লাগল!

হরবিলাস আর তার বিলাসের বালিশ দেখে আমার মনে দুঃখ হল। ঠিক করলাম এদের মনোবেদনা ঘোচাবো। হাজার হোক হরবিলাস তো আমার বন্ধু। আর ওর বালিশ! প্রায় বেকার-আমার জীবনের মহাসমুদ্রে ওই আমার সান্ত্বনার নীলদ্বীপ। দুজনেই আমার বড় প্রিয়।

হরবিলাসের কাছে কথাটা পাড়লাম। ভণিতা শেষ করে বেশ জোর দিয়ে জানালাম হরবিলাসের এখন কোথাও যাওয়া উচিত। বাইরে গেলে শ্রীমতীর কথা নাও মনে পড়তে পারে। বন্ধুবর গোঁয়ারের মত প্রথমেই না বলে বসল। তারপর বহু তর্কাতর্কির পর নিমরাজী হল। এবং সন্ধ্যার পর ভীষণ উৎসাহী হয়ে উঠল। ওর মুসৌরী যাওয়া চাইই। কারণ ওর শ্রীমতীও নাকি নতুন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে মুসৌরী পাহাড়ের দিকে। এতে আমার মত নেই। এতে যে আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড। আমি তাই প্রস্তাব করলাম গোপালপুর কিংবা ওয়াল্টেয়ারের। হরবিলাস বলল, না। আমি চাই সমুদ্রে যেতে, ও চায় পাহাড়ে। তাও অন্য কোনো পাহাড়ে নয়। মুসৌরীর পাহাড়ে ও যাবেই। ওরটাই জিতল—কারণ সমুদ্র বা পাহাড় যেখানেই যাই টাকার পাহাড় লাগবে। আর আমি তো ফুটো

মাদ্রাজী। তাই হরবিলাস ভরসা। অতএব জয়, শ্রীমতীপশ্চাদ্ধাবিত শ্রীহরবিলাসেরই জয়।

নির্ধারিত দিনে রওনা দিলাম আমরা। হাওড়া স্টেশনে হরবিলাস এক কাণ্ড করে বসল। ওর শ্রীমতীরও নাকি আজই মুসৌরী যাবার কথা। ডুন এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর সংরক্ষণ তালিকা দেখতে দেখতে দেখা গেল একটা চার বার্থওয়ালা কম্পার্টমেণ্টে মিস মঞ্জু দত্তের নাম লেখা আছে। হাওড়া থেকে দেরাদুন রিজার্ভেসন। এঃ, হরবিলাস মাথা চুলকোতে লাগল, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আগে জানলে আমিও তো ফাস্ট ক্লাশ বার্থ রিজার্ভ করতাম। কিন্তু—ওর মাথা চুলকানি বেড়েই গেল।

বললাম, কিন্তু কি?

মঞ্জু যাবে ফাস্ট ক্লাশে, আর আমরা থ্রী টায়ারে! না, তা হতেই পারে না। আমরাও ফাস্ট ক্লাশে যাবো। বিশেষ ঐ একই কামরায় হয়ত দু'খানা বার্থ খালি আছে।

হরবিলাসের পাগলামিতে অবাক হলাম। ওর মাথাটা কি পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে! নিশ্চয়ই তাই। কারণ ওকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেও কাজ হলনা। প্রেমোন্মাদ আর বদ্ধ উন্মাদে বিশেষ পার্থক্য নেই বোধহয়। তাই অল্প সময়েই হরবিলাস থ্রী টায়ারের টিকিট দুটোকে প্রথম শ্রেণী করে নিল এবং বার্থ নিল একই কম্পার্টমেণ্টে।

ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র দুমিনিট বাকী। মিস মঞ্জু দত্ত এসে হাজির হলেন। মিসকে দেখলাম। প্রৌঢ়া দিদিমণি চেহারার এক ভদ্রমহিলা। এঁর সঙ্গে হরবিলাসের—! যত সব! হরবিলাসটা সত্যিই বদ্ধ পাগল। নইলে এমন হয়! জিজ্ঞাসু চোখে চাইলাম ওর দিকে। কোথায় হরবিলাস! নিজের বার্থে শুয়ে উপরের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে। আর সিগারেট টানছে ঘন ঘন ধোঁয়া ছেড়ে। বুঝলাম আসল মিস্ মঞ্জু দত্ত আসেন নি। হরবিলাসের জন্য আবার ভীষণ কষ্ট লাগল। প্রিয়াহীন জীবনে নতুন শোক জাগবে—এবার অর্থশোক। আহা বেচারী!

ট্রেন ছাড়ল। হরবিলাসের মুখে কথা নেই। ছেলেটা বোবা হয়ে গেল নাকি! চমৎকার বালিশটিতে কনুই ঠেসান দিয়ে কাত হয়ে আছে সে। আমার বার্থ ছেড়ে ওরটায় বসলাম। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। আমি ওকে ঠেললাম। ইচ্ছে হরবিলাস কথা বলুক, আগের মত চেঁচাক, আমায় গালাগাল দিক। কিন্তু না, হরবিলাস কিছু বলবে না। একবার ওর আদরের বালিশটির দিকে তাকাল। পরম স্নেহে তার গায়ে হাত বোলাল। তারপর বালিশটি হাতে করে উঠতে গেল। না, আমি কিন্তু উঠতে দেব না। এক মুহূর্ত হরবিলাস আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বালিশ ছেড়ে উঠে আমার বার্থে গিয়ে বসল।

বুঝলাম আজ হরবিলাসের সঙ্গে বকা বৃথা। অতএব বালিশ টেনে আমিই শুলাম, আর শুয়ে শুয়ে ওর প্যাকেট থেকে দামী সিগারেট খেয়ে চললাম। আজ জানি রাত্রে আমার ঘুম হবে না। একে ট্রেনে আমার ঘুম হয় না কোনোকালে। তার উপর হরবিলাসের চিন্তা এবং তার ভালো সিগারেটের আকর্ষণ! আমার নাকের ডগায় তাই ধূম্রজাল রচনা হতে লাগল। হরবিলাসের দুর্ভাগ্যের কথা মাথায় ঘুরতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে।

রাত বোধহয় গভীর। তুন এক্সপ্রেস জোরে ছুটে চলেছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। কামরার ভিতরও প্রায় অন্ধকার। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলাম। ঘাড়ের কাছে কি কামড়াল! হাত বাড়িয়ে আলো জ্বাললাম। কি সর্বনাশ! বালিশ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে। আগুন লেগেছে নাকি! হতে পারে। সিগারেট টানতে টানতে হয়তো তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। আর তখনি! হরবিলাসের দিকে চাইলাম! আমার বিছানার উপর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে ও। ঠোঁট দুটো শুধু মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাও ভালো, হরবিলাস ঘুমিয়ে। নইলে শোকসন্তপ্ত হরবিলাস ওর বালিশের দশা দেখে হয়ত চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়েই পড়ত। হয়ত বা, আর হয়ত কেন, নিশ্চয়ই আমাকেও ওর অন্তিম লম্ফনের সঙ্গী করত। ভয়ে শিউরে উঠলাম সে কথা ভেবে।

হরবিলাসের দিকে আবার চাইলাম। না, ও বুঝতে পারেনি কিছু। তাড়াতাড়ি হাত বাড়ালাম। জলের বোতল থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে বালিশের পোড়া জায়গাটায় ঢেলে দিলাম। তার উপর নির্বিকার ভাবে জায়গাটা চেপে ধরে চেয়ে রইলাম ধূম্র নির্গমনের প্রকৃতির দিকে। একটু পরেই ধোঁয়া বন্ধ হল। বুঝলাম আগুন নিভে গেছে।

আগুন তো নিভল। কিন্তু সমস্যার শেষ হল কি! নতুন সমস্যা দেখা দিল। কাল হরবিলাস যখন ওর পরম প্রিয় বালিশের এই হাল দেখবে তখন আমার কি হাল হবে!

বালিশের পোড়া দিকটা উল্টে দিলাম। হরবিলাসের বালিশ আবার নীল সাগরের বুকের ওপর ওড়া এক ঝাঁক সাদা বকের মত হেসে উঠল। আমিও হেসে উঠলাম। আপাতত বিপদটা তো কাটল!

ট্রেন চলেছে তো চলেইছে। এক সময় সকাল হল। হরবিলাসও নতুন রৌদ্রের সাথে খানিক চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। দুপুর গড়াল, বিকাল গড়িয়ে রাত্রিও আসল। আমি কিন্তু হরবিলাসের বালিশের কাছছাড়া হইনি, মানে বালিশকে কাছছাড়া হতে দিইনি। হরবিলাস অনেক চেষ্টা করেছে বালিশ হাতাতে, আমি হাত দিয়ে আটকেছি। বালিশে হাত রেখে হরবিলাসকে হাত করতে চেয়েছি ওর অভূতপূর্ব প্রেয়সীর (ভূতপূর্ব প্রেয়সী বলা বোধহয় সঙ্গত) সমালোচনা করে। হরবিলাস যত রেগেছে ততই

ও বালিশ থেকে দূরে সরেছে আর আমিও পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলেছি।

দ্বিতীয় রাত্রি প্রভাত হল। উদ্বেগের মধ্যে এক সময় দেরাদুন স্টেশনও এসে গেল। এবার হরবিলাসের বিছানা বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে আমিই সুন্দর করে বাঁধলাম। হরবিলাসকে কেমন মিয়ানো মনে হল ' যেন জলে ভেজা কাক। কিন্তু দেরাদুন থেকে বাসে করে যখন মুসৌরী পাড়ি দিলাম তখন হরবিলাসকে বেশ খুশীই লাগল। সুন্দর মসৃণ রাস্তা। ঘুরে ঘুরে বাস উপরে উঠছে আর মনে হচ্ছে যেন মেঘের দেশে পাড়ি জমিয়েছি। নীচে ডুন উপত্যকাকে মায়াময় মনে হচ্ছে আর হরবিলাস কোন এক স্বপ্নের দেশের নির্জনে অলীক প্রিয়াকে নিয়ে নতুন ঘর বাঁধছে। ওর চোখের কাঁপা কাঁপা পাতায় জমা স্বপ্ন গভীর থেকে গভীরতর হল। আমি ওর বিহ্বল ভাবে চকিত হয়ে উঠছি এমন সময় মুসৌরী এল।

বাস স্ট্যাণ্ডে হোটেলওয়ালাদের ভিড়। সুন্দরী মুসৌরীর হোটেল-ওয়ালাদের ভিড়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলাম। শিকার হলাম মাঝারী ধরনের একটি হোটেলের। তার দোতলার একটি ঘরের কাঁচের জানালার পাশে আমি নিজ হাতে হরবিলাসের বিছানাটা বিছিয়ে দিলাম। সুন্দর বালিশটি সুন্দরতর হয়ে ঝিকিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে হরবিলাসের মনও। এক কাপ গরম চা খাওয়া হতেই আমার হাত ধরে ও টানতে টানতে বাইরে নিয়ে চলল অপূর্ব আনন্দের ইশারায়।

মুসৌরী শহর সত্যিই বিচিত্র। প্রকৃতির রূপের ছটায় রং ঢেলেছে রঙীন পরীর দল। ঘুরছি আর দেখছি, দেখছি আর ভাবছি, ভাবছি আর ক্রমশ নিজেকে বেমানান খুঁজে পাচ্ছি মুসৌরীর জৌলুষের মধ্যে। তবু ঘুরছি কারণ ঘুরতে হচ্ছে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম অর্থাৎ হরবিলাস ঘোরাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে ও ব্যাকুল ভাবে কাকে যেন খুঁজছে। আকুল চোখে ওর করুণ আর্তি। যতই খুঁজছে ততই ওর ব্যাকুলতা-আকুলতা যেন বেড়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা নামল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। বিশ্রাম দরকার। কিন্তু হরবিলাসের দৃষ্টি এড়িয়ে পালাবার উপায় নেই। আমি যেন জেল ভাঙা কয়েদী। হরবিলাসের ক্লান্তি নেই। পথ চলতি হাজারো মেয়ের মুখে ওর উদগ্রীব চোখ দুটি প্রিয় মুখটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চলেছি তো চলেইছি। লাইব্রেরী বাজার থেকে কুরলা বাজার। আবার আর এক পথে স্কেটিং রিং। ওখান থেকে সিনেমাপাড়া। চলতে চলতে হঠাৎ হরবিলাসের চোখ আটকে গেল একটি রেস্তোরাঁর কাঁচের জানালায়। ঐ তো মঞ্জু, হ্যাঁ, মঞ্জুই তো! গালে হাত রেখে বিমুগ্ধভাবে সামনে বসা একটি সুন্দর চেহারার যুবকের কথা শুনছে। হরবিলাস দৌড়ল রেস্তোরাঁর দিকে। ও যে উন্মাদ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাধা দিতে গিয়ে গোত্তা

খেলাম। বেশ জোর গোত্তা। রাগ হল খুব। যে যেখানে খুশী। যা-খুশী কর। আমার কি! হরবিলাসের গমন পথের দিকে একটু তাকিয়ে থাকলাম। তারপর গুটি গুটি ফিরলাম একাই আমাদের আস্তানার দিকে।

হোটেলে ফিরতেই আবার হরবিলাস। মানে ওর বালিশ! ঝকঝকে চোখে আমায় ডাকছে। লোভ সামলাতে না পেরে খানিক মাথা রেখে তাতে শুলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়ালও নেই। ঘুম ভাঙল দরজার ধাক্কায়। হরবিলাস ফিরেছে।

দরজা খুললাম বিরক্তভাবে। হরবিলাস শিস দিতে দিতে ঘরে ঢুকল। ওর মেজাজটা বেশ খুশ মনে হচ্ছে! তবে কি প্রেয়সীর আদর লাভ হল নাকি! কিন্তু ওর মুখ দিয়ে কিসের গন্ধ বেরোচ্ছে! হুঁ, অ্যালকোহলের গন্ধ মনে হচ্ছে হরবিলাস কি মদ খেয়েছে! বিচিত্র কিছু নয়। ঠাণ্ডার দেশে বেড়াতে এসে বারে ঢুকে যদি একটু ফুর্তিই না করল তো করল কি! মেয়েটাও সঙ্গে ছিল নাকি! তবে তো কম্ম কাবার। বারে বসে ফেরবার ট্রেন ভাড়াটা পর্যন্ত হরবিলাসের ব্যাগ থেকে বার করিয়ে ছাড়বে। প্রেমের ব্যাপারে ছাড়াছাড়ি বলে কি টাকার ব্যাপারেও তাই! বরং এক্ষেত্রে কাছাকাছি কাড়াকাড়িই ভালো জমবে। হরবিলাসের দিকে তাকালাম। হতচ্ছাড়াটা টলোমলো পায়ে নাচছে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। ইচ্ছা হল ঘা কতক দিই হতভাগাকে। কিন্তু ইচ্ছা চাপলাম। রাগতভাবে জিজ্ঞাসা করি, কি হচ্ছে ওটা?

—নাচছি। ফক্সট্রট্! মঞ্জুর সঙ্গে নেচে এলাম। ও মাই ডিয়ার, কাম নিয়ার, ডোন্ট ফিয়ার—

ও বাবাঃ, এ যে দেখি গানও গায়! ওর কি সত্যিই মাথা খারাপ হল! নাকি মঞ্জু ওকে আর এক পাক নাচাল! কিন্তু না, একে জোর করে না শোয়ালে আজ রাতে কেলেঙ্কারি হবে! এখন তো আসল ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। তাই ওর নেশা কাটা আগে দরকার। ঠেসে চেপে ধরলাম হরবিলাসকে এবং শোয়ালাম জোর করে। এবার ওর নিজের বিছানায় এবং নিজের বালিশে। ও শুয়ে শুয়ে শিস দিতে লাগল আর সিগারেট টেনে যেতে লাগল।

সকালে ঘুম ভাঙল হরবিলাসের চিৎকারে। আহত পশুর মত বেচারা গোঙাচ্ছে। হাহাকার করছে বুক চাপড়িয়ে। কখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছে মুখ ঢেকে। ব্যাপার কি! হরবিলাস কথা না বলে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল। ওতেই হল। ভয়ে আমার লাঙ্গুল গুটিয়ে এল। হরবিলাসের বালিশ পোড়া আর সেটা আমারি কাজ। বুকটা ধ্বক করে উঠল। কিন্তু না, বেঁচে গেলাম হরবিলাস কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল—আর এখানে থাকবো না রে! এখানে এসে আমার সব গেল! সম্মান গেল, টাকা পয়সা গেল, প্রেম গেল, জাত

গেল, আর সবচেয়ে বড় এমন সুন্দর মখমলের বালিশটা পুড়ল। আর শুধু নিজে পুড়ল না, আমার মুখও পুড়িয়ে গেল। জাত বৈষ্ণবের ছেলে হয়ে আমি নষ্ট মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে মদ খেলাম। আর মদ খেয়ে সাধের বালিশ পোড়ালাম। ঐ সঙ্গে আমি নিজেও পুড়লাম না কেন রে!

হরবিলাসের বিলাপে আর প্রলাপে বেলা বাড়ল। কিন্তু অন্য আলাপে ওর মন নেই। ক্ষিধে পেয়েছিল। আমি খেতে গেলাম। একাই। ক্ষিধে পেটে আলাপ বা প্রলাপ কোনোটাই আমার বরদাস্ত হয় না। দুইই গায়ে কেটে কেটে বসে। ভরা পেটে হুজ্জোত সহ্য যায়। পেটে খেলে পিঠে সয় কথাই আছে।

খেয়ে-দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে ফিরলাম। হরবিলাস সব কিছু বেঁধে-ছেঁদে তৈরী। মায় আমার বিছানাটাও বেঁধে ফেলেছে। সে চলে যাবে। এ নরকে আর এক মুহূর্তও নয়।

হোটেলের ছোকরাটাকে ডেকে মালপত্র নামাচ্ছি, হঠাৎ চোখ পড়ল খাটের নীচে। ওকি, হরবিলাস যে তার মনোহর বালিশ ফেলে যাচ্ছে! সর্বনাশ! দ্রুত সেদিকে ধাবিত হতে যাই। কিন্তু বাধা পেলাম। হরবিলাস জামার হাতাটায় এমন টানল যে হাতাটাই আমার যাচ্ছিল প্রায়।

—বালিশ, তোর বালিশ ফেলে যাচ্ছিস যে! আমি আর্তস্বরে বলি।

—তোর কি? হরবিলাস আমায় আরো জোরে টানে। হাতা ছেড়ে এবার হাতে। টানের চোটে দরজার চৌকাঠ ছাড়িয়ে বাইরে ছিটকে যাই।

—বালিশটাকে রেখেই গেলাম রে। কি হবে ও পোড়া বালিশে! মঞ্জুও আধপোড়া, বালিশটাও তাই! দুটোকেই এখানে, এই অভিশপ্ত পাহাড়ে ফেলে গেলাম।

হরবিলাস হাতের চেটোয় চোখের জল মোছে। দেখাদেখি আমিও।

# পাগল

অনেক সময় হা হা করে অট্টহাসি হাসে লোকটা। মাঝে মাঝে কাঁদেও—কখনো ফুঁপিয়ে, কখনো বুক চাপড়ে। পুরুলিয়া শহরের আনাচে কানাচে তাকে অনেকদিন নগ্নপ্রায় অবস্থায় আপন মনে কথা বলতে বলতে যেতে আপনারা দেখে থাকবেন। নাডিহা থেকে কুক্‌স কম্পাউণ্ড সে আপন মনে ঘোরে। দুল্‌মির সরকারী কোয়ার্টার্সগুলোর দিকে করুণ নয়নে চায়। সন্ধ্যার আব্‌ছা আঁধারে স্টেশনের ধারের চায়ের দোকানগুলোর সামনে সে হাত পেতে দাঁড়ায়। বিশেষ বিশেষ দিনে বোঙাবাড়ীতে বা সার্কিট হাউসে যখন আলোর রোশনাই জাগে বিশিষ্ট মানুষজনের হাজিরায়—তখন রবাহুতের মত সেও যেয়ে পৌঁছায় এবং হঠাৎ হাসিতে পলিটেকনিক এবং আরো ওদিকে গার্লস কলেজের অধ্যাপিকাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। ওর হঠাৎ গোঙানিতে সার্কিট হাউসের বাসিন্দারা চম্‌কে ওঠেন। রাঁচী রোডের ধারে অফিসার পাড়ার বাড়ীগুলোর জানালার রঙীন পর্দা ঠেলে সে কান্নার ঢেউ ঘরে প্রবেশ করে—এস্‌-ডি-ও সাহেবের স্ত্রী অস্ফুটে হয়ত স্বগতোক্তি করেন, পাগলটা আবার এলো!

পাগল! সত্যিই পাগল লোকটা। আপনারাই তো ওকে দেখেছেন পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে। আর ওর চোখের চাহনি? সেদিকে কেউ লক্ষ্য করেছেন? বদ্ধ উন্মাদের দৃষ্টি সেখানে বাসা বেঁধেছে। প্রায় পাকা দাড়ি গোঁফের আড়ালে একটা অসহায়, করুণ, বোবা ভাব মানুষটাকে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু উন্মাদ নিয়ে মাথা ঘামাবার আপনাদের সময় কই!

তবু সেদিন নীলকুঠি ডাঙার রাস্তায় পাঞ্জাবী ট্রাকওয়ালা যখন লোকটাকে পাশ থেকে ধাক্কা মেরে পালাল, ওর রক্তাক্ত মুখের দিকে চেয়ে আপনাদের সব সহানুভূতি আচম্‌কাই ওর ওপরে গিয়ে পড়ল। আপনারাই ওকে হাসপাতালে পাঠালেন। তারপর ভারাক্রান্ত মনে বাড়ী ফিরলেন। স্ত্রীকে দুর্ঘটনার কথা বলেও আপনাদের কারো কারো চিন্তা গেল না। রাত্রে শুয়ে তাঁদের মনে ভেসে আসতে লাগল উন্মাদ লোকটার ক্ষত-বিক্ষত মুখটা। অব্যক্ত বেদনার সুতীক্ষ্ন ছাপ দেখলেন তাঁরা সে মুখে। এক সময় ঘুমিয়েও পড়লেন তাঁরা। কিন্তু ঘুমের ঘোরে এঁদের মধ্যেই একজন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। আপনিই সেই জন। আপনি দেখলেন একটা পুরো গল্প, একটা সতেজ জীবনের ট্রাজিক পরিণতি। শিউরে ওঠেন আপনি। আপনার ঘুম ভেঙে যায়।

ডাঃ বিমল কর, এল্‌-এম্‌-এফ্‌—প্রতাপপুর সরকারী হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার। বছর পঞ্চাশেক বয়েস, মাথার চুলের সঙ্গে মুখের দাড়ি-গোঁফও কাঁচা-পাকা। তবে খুঁতিয়ে না দেখলে দাড়িগোঁফের রং বোঝা যায় না, নিয়মিত ভাবে যত্নে কামানো ওঁর মুখ। লঝ্‌ঝড়ে পুরনো সাইকেলটার ভাঙা হ্যাণ্ডেলে রং ওঠা চামড়ার ব্যাগটা ঝুলিয়ে একমুখ হাসি নিয়ে দাঁড়ালেন—'গুড মর্নিং, স্যার। এক কাপ চা পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আসুন আসুন। তারপর ডাক্তারবাবুর খবর কি? ডিসপেনসারি গেলেন না?'

'ওতো আছেই, স্যার। কম্পাউণ্ডার বাবু আছেন, তিনিই রুগী বিদায় করবেন।'

'কম্পাউণ্ডার বাবু রুগী বিদায় করবেন?'

'এ কি আর, স্যার, তেমন কঠিন কাজ? ওইতো কোনো একটা এ্যাণ্টি-বায়োটিক, এল্‌কোসিন, কারমিনেটিভ মিক্‌শ্চার, নয়তো একটা ঘায়ের মলম বা কোনো একটা জোলাপ। অনেককে একটু ভিটামিন, এমনকি তার্পিন তেল দিলেও হয়। এদেশের রুগী স্যার যে কোন ওষুধের খানিকটা রঙীন জল অথবা কয়েকটা বড়ি পেলেই খুশী।'

চারমিনার সিগারেটটা বাড়িয়ে দিতে দিতে আপনি হয়ত একটু ঠাট্টা করেই বললেন, 'তাহলে তো তোফা আছেন—ঘরে বসে মাইনে, তার উপর প্রাইভেট প্র্যাকটিশ।'

একগাল হাসলেন ডাঃ বিমল কর। 'তোফা কই আর আছি! সে ছিলাম বাবার হোটেলে। ক'লকাতায় হোস্টেলে থাকতাম আর গড়ের মাঠ, সিনেমা-থিয়েটার করে বেড়াতাম। বুঝলেন না, তখন জুম্মা খাঁ, গোষ্ঠ পাল, কেদার দত্ত এদের যুগ। চারধারে শুধু খেলা আর খেলা। দায় নেই, দায়িত্ব নেই, কিছু নেই।'

আপনি ঔৎসুক্য বোধ করেন! 'আপনি খুব খেলতেন বুঝি?'

'খেলতুম না মানে! জেলা টীমের সঙ্গে কোথায় না গেছি বলুন, স্যার! হাজারীবাগ, পালামৌ, মুঙ্গের, বেনারস সব চষে ফেলেছি। আর শুধুই কি ফুটবল? হকি, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস সবই খেলেছি। একবার বুঝলেন না, আসানসোলে হকি খেলতে খেলতে সারওয়ারবেগকে স্টিক দিয়ে এমন মেরেছিলাম যে সে রোডে সিট।'

'রোডে সিট?' আপনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন।

'মানে বুঝলেন না? এ'সব এডিনবার্গের ইংরিজি—মানে পথে বসা।'

এডিনবার্গের ইংরিজির মানে বুঝে আপনি হেসে অস্থির।

আপনার খুব ভালো লাগে হাসি খুশী রসিক ডাক্তারটিকে। আরো

জমিয়ে আলাপ করতে চান আপনি। জিজ্ঞাসা করেন, 'কতদিন হ'ল আপনার এখানে, ডাক্তারবাবু?'

'তা তিন বৎসর প্রায় হল।'

ডাক্তারবাবু এবার আপনাকে সিগারেট বাড়িয়ে দেন। 'না উঠি, স্যার। একবার মধুপুর যেতে হবে। ওখানে একটা ইন্‌জেকসন আছে। দেরী হলে আবার প্রফুল্লটা হাজির হয়ে যাবে।'

'প্রফুল্ল আবার কে?' আপনি অজ্ঞতার ভান করেন।

'ওইতো ব্যাটা ছুঁচো ডাক্তার। খালি আমার নামে কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে।'

'প্রফুল্লবাবু তো এম্‌. বি.।' ডাক্তারকে খোঁচান আপনি।

'না না', অবজ্ঞা ভরে বলেন ডাঃ বিমল কর, 'এম, বি কোথায় পাচ্ছেন স্যার? ও অবশ্য বলে এল্‌-এম-এফ্‌, কিন্তু আসলে কোয়াক। বোকার দেশ বলে ঠকিয়ে খাচ্ছে। এই সেদিন তো একটা ডেলিভারী কেসে স্রেফ পেনিসিলিন আর গ্লুকোজ দিয়ে চারশ' টাকা মারল। পেসেণ্ট অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাঁচল আমার হাতে।' ডাঃ বিমল কর গর্ব ভরে তাকান আপনার দিকে।

'আচ্ছা গুড নাইট, স্যার।' ডাক্তারবাবু উঠতে যান।

সকাল দশটায় গুডনাইট শুনে আপনি একবার ডাক্তারবাবুর আপাদমস্তক দেখেন। তারপর এডিনবার্গ সংস্করণ মনে পড়ায় আপনিও হেসে বিদায় জানান, 'গুড নাইট।'

ডাঃ বিমল করের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেছে। সদা হাস্যময়, সরল লোকটিকে আপনি অন্তর থেকে ভালবাসতে শুরু করেন। উনিও আপনাকে পেয়ে ভারি খুশী হন। বিকালে খেলার মাঠে উনি আছেন। সকালে আপনাদের চায়ের আসরে উনি নিয়মিত হাজিরা দেন। আর সন্ধ্যার পর আপনাদের যে তাস খেলার আড্ডা জমে তাতেও ওঁকে অনুপস্থিত থাকতে কোনদিন দেখা যায়নি। আশ্চর্যের কথা, ডাঃ কর নিজে তাস খেলেন না। কন্ট্রাক্ট ব্রীজের নামটাই ওঁর শুধু জানা অথচ অভূতপূর্ব তিতিক্ষা আর ধৈর্য নিয়ে উনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার পাশটিতে বসে থাকবেন এবং আপনার জয়ই কামনা করবেন। তাসের আসরে খেলোয়াড়রা আসুক বা না আসুক, ডাক্তারবাবুর উপস্থিতি সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ।

সন্ধ্যার পর ডাঃ কর প্যাণ্ট শার্ট ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরেন। মুখে গলায় ওঁর পাউডার স্নোর প্রলেপও উগ্র হয়ে ওঠে। গায়ের এবং রুমালের সস্তা আতর বা সেণ্টের গন্ধের সাথে মাথার তেলের গন্ধ মিলে বিচিত্র গন্ধের সৃষ্টি হয়। আপনি হয়ত ঠাট্টা করলেন ওঁর প্রসাধন দেখে, 'ডাক্তারবাবু, আর কেন? এ' বয়সে এত গন্ধ টন্ধ মাখা আপনাকে মানায় না।'

মুহূর্তে বিস্ময় প্রকাশ করবেন ডাঃ কর। 'কেন, স্যার, বয়সটা আমার কি

এমনি বেশি। আমার মধ্যে ইউথফুল এক্সারবারেসন ( Youthful exuberance ) কোথায় কম দেখেছেন আপনি ?'

আপনার ইচ্ছা হয় ডাক্তারবাবুর ভ্রম সংশোধন করে দিতে। কিন্তু এডিনবার্গের ইংরাজী এমন হয় কিনা মনে মনে চিন্তা করেন। 'তা নয়, ডাক্তারবাবু আপনারা হলেন কাননবালার যুগের লোক। এখন এসব আপনাদের ঠিক মানায় না। এ যুগটা যে সুচিত্রা, সুপ্রিয়ারও হাত ছাড়া হয়ে গেছে।'

উত্তরের অভাব ডাঃ বিমল করের কোনোদিন হয় না। হাসতে হাসতে উনি বলেন, 'কিন্তু স্যার, কাননবালার যুগের নায়ক অশোককুমার যে সেদিনও নায়ক রয়েছেন। ধর্মেন্দর-দেব আনন্দের কথাই ভাবুন না! আমি যে ঐ দলেই পড়ি।'

হেসে ওঠেন সবাই। হাসেন আপনিও। এ লোককে প্রসাধন করবেন না বলা যায় না।

ও'র স্ত্রী অবশ্য এ নিয়ে অনুযোগ করেন। 'দেখুন তো ভাই, যখন সখের সময় তখন তিনি বেড়াতেন বাউণ্ডুলে হয়ে, আর এখন বুড়ো বয়সে শৌখীন হয়ে উঠেছেন কেমন!'

কথাটা শুনে ডাক্তার কর গম্ভীরভাবে স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'Your eyes should be eyed.'

ও'র স্ত্রীর জ্ঞান আপনার পর্যায়েরও নয়। তিনি তাই অর্থ কিছু বোঝেন না। বোঝেন না আপনিও। বিস্মিতভাবে ডাক্তারবাবুর দিকে চান। 'সে আবার কি ডাক্তারবাবু ?'

'মানে বুঝলেন না ?' প্রশান্ত ভাবে হাসেন ডাক্তার। 'ওর চোখ দেখানো দরকার।'

'কেন ?' স্ত্রী প্রশ্ন করেন।

'কেন আবার ? তুমি আমাকে বুড়ো দেখছ বলে। যে বুড়ো সত্যিই নয় তাকে বুড়ো বলাটা আমি পছন্দ করি না একটুও।'

'না না, আপনি বুড়ো হবেন কেন! আপনাকে তো বেশ Youngই বলা যায়। কিন্তু ডাক্তারবাবু, ঐ কথাটা কোথায় পেলেন বুঝলাম না।'

'কোনটা ?'

'ঐ যে বল্লেন your eyes should be eyed'

সামনের ভাঙ্গা দাঁত দুটো বার করে হাসেন ডাক্তার কর। 'এটা বুঝলেন না ? X-ray থেকে X-rayed যদি হয় তবে eye থেকে eyed কেন হবে না বলুন!'

যুক্তির গভীরতায় আপনি মুগ্ধ। না বলার উপায় নেই আপনার। তবে হাসবেন না কাঁদবেন বুঝে উঠতে পারেন না।

আপনি সেদিন ডাক্তার বিমল করের বাড়ীতে গিয়েছেন চায়ের নিমন্ত্রণে!

এ রকম নিমন্ত্রণে আপনি মাঝে মাঝেই যান। বৌদি ওরফে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী খুব স্বজন বৎসলা, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমতী। বলা বাহুল্য ঘরের এবং মাঝে মাঝে বাইরের সমস্ত ঝামেলাই তিনি সামলান।

'আসুন, ভাই, আসুন। আপনি অনেকদিন পরে আসলেন কিন্তু।' অনুযোগ করেন বৌদি অর্থাৎ ডাঃ করের স্ত্রী।

'এই সেদিনও তো আসলাম, বৌদি।' আপনি প্রতিবাদ করেন।

'কোথায় ভাই! আপনাকে ডেকে না পাঠালে আপনি নিজে থেকে কোনদিন আসেন না।'

লুচি-মিষ্টান্ন সহযোগে আপনি আহারে ব্যস্ত এমন সময় প্রবেশ করল একটি সুঠাম যুবক। সুশ্রী খুব না হলেও মুখে তার এমন একটা ভাব আছে যা সবাইকে আকর্ষণ করে। আপনি সপ্রশ্ন চোখে বৌদির দিকে চাইলেন। বৌদি হাসলেন 'আমার ভাই, প্রদ্যোৎ।'

'আপনার ভাই!' বিস্মিত প্রশ্ন আপনার। কারণ আপনি শুনেছেন বৌদির একমাত্র ভাই আট দশ বছর আগে পালিয়ে বিলেতে গিয়ে আর ফেরেনি সে দেশেই ঘর সংসার পেতেছে।

বৌদি থতমত খান একটু। সামান্য হেসে বলেন, 'আমার ভাই মানে এর সঙ্গে আমার ভাইয়ের সাদৃশ্য আছে অনেক। তাই ভাই-এর মতই দেখি একে।'

ডাক্তার কর চুপচাপ খাচ্ছিলেন। এবার কথা বল্লেন বিরক্তভাবে। 'কোথায় মিল যে তুমি পাও। তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।'

লজ্জা পান বৌদি। অপ্রিয় অবস্থা কাটাতে আপনি প্রসঙ্গান্তরে যান। প্রদ্যোৎ উঠে ভিতরে যায়। আপনি বাইরের ঘরে বসে শুনতে পান ডাক্তার করের একমাত্র সন্তান মীরা কলকণ্ঠে প্রদ্যোৎকে আহ্বান জানাচ্ছে। প্রদ্যোৎ সম্বন্ধে আপনিও কিছু কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

ডাঃ বিমল করই সে কৌতূহল মেটান। প্রদ্যোৎ ছেলেটি ভালো, স্যার। এখানকার স্কুলে নতুন এসেছে। ইংরাজী পড়ায়। আমার মেয়েটার জন্য ভালো একজন টিউটর খুঁজছিলাম তা ওকেই রেখেছি। পড়ায় ভালো। কিন্তু আমার ওয়াইফ ওর সঙ্গে নিজের ভাইয়ের মিল কোথা থেকে খুঁজে পেয়ে ভাই ভাই করেই অস্থির।'

অপ্রিয় আলোচনা চালিয়ে যাওয়াটা আপনার অভিপ্রেত নয়। তাই প্রসঙ্গান্তরে যান। আপনি ডাক্তারের ছাত্রজীবন নিয়ে পড়েন।

ডাক্তারের বাড়ী ছাড়বার আগেই আপনার কাছে একটা অনুরোধ এল। অনুরোধ জানালেন ডাক্তার গৃহিণী। 'মীরার জন্যে একটা ভালো ছেলে খুঁজে দিন ভাই। মেয়ে বড় হ'ল—ও'র কিন্তু কিছু হুঁশ নেই।'

'ওইটুকু মেয়ে, ওর কি বিয়ে দেবেন এখন?' আপনি বল্লেন, 'আরো বড় হোক, বি-এ-টা অন্তত পাশ করুক।'

'ভাগ্যে থাকলে পরে পাশ করবে। মেয়ের বয়স আঠারো উনিশ উৎরে গেল, এখন থেকে খোঁজ খবর না নিলে চলবে কেন ভাই? আপনাকে একটা ভালো ছেলে দেখে দিতে হবে।'

ঘটকালির ব্যাপারে আপনার কোনো প্রকার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও যোগ্য পাত্র খুঁজে দেবার চেষ্টা করবেন বলে আপনাকে কথা দিতেই হয়। খানিক আগেই ডাক্তার গৃহিণীর দেওয়া মিষ্টিগুলোর স্বাদ তখনও আপনার মুখে জড়িয়ে আছে।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। এর মধ্যে ডাক্তার করের স্ত্রী ও কন্যা রামপুরহাটে ডাক্তারের স্ত্রীর পিত্রালয়ে গিয়েছেন। আগের মতোই ডাক্তার ডিস্পেন্সারী, রুগী, আড্ডা ও এডিনবার্গের ইংরাজী নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। স্ত্রী-কন্যা সম্বন্ধে নির্বিকার থাকেন পুরোপুরি, কোনো কথাই বলেন না। ওঁর এই উদাসীনতা আপনার খুব আশ্চর্য মনে হয়।

আপনি কৌতূহল দমন করতে পারেন না দীর্ঘকাল। একদিন ডাঃ করকে জিজ্ঞাসা করে ফেলেন, 'কি ডাক্তারবাবু, বৌদির চিঠি-টিঠি পান?'

এক গাল হাসলেন ডাক্তার। 'পৌঁছে খবর দিয়েছে তো!'

'সে তো শুনেছি একটা পোস্টকার্ডে। খামে ভালো করে কাব্য করে চিঠি দেননি আর?'

'সে সব দিন কি আর আছে স্যার! এক কাল গেছে যখন অমন চিঠি রোজ পেতাম, আর রোজই উত্তর দিতাম। তখন বুঝলেন না, দশটার আগেই পোস্টাফিসে হাজির হতাম চিঠির খোঁজে। Those days are gone—এখন আমরা সব old fools.'

ডাক্তার নিজেকে ওল্ড ফুল বলায় অনেক কষ্টে আপনি হাসি সংবরণ করেন।

'আপনি কোনো চিঠি দেননি বৌদিকে?'

'আমি আর কি দেব! ও আমার কম্পাউন্ডারবাবুই দিয়ে দিয়েছে।'

'কম্পাউন্ডারবাবু আপনার হয়ে চিঠি দিয়েছেন?' অকৃত্রিম বিস্ময়ে আপনি শুধোন।

'আঃ তাই বলে কী আমার জবানবন্দী দিয়েছে। এখানকার খবর সব জানিয়ে দিয়েছে।'

নিঃশ্বাস ফেলেন আপনি। বিচিত্র লোক এই ডাক্তার।

এহেন ডাঃ বিমল করকে আপনি সেদিন প্রথম চিন্তিত দেখলেন। গম্ভীর মুখে কেমন যেন বিষাদ আঁকা। ভীষণ খাপছাড়া লাগল আপনার। নিশ্চয়ই কোথাও বিরাট রকমের ছন্দপতন ঘটেছে!

'কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু, মুখখানা অমন ভার ভার লাগছে কেন?'

হাসবার চেষ্টা করেন ডাঃ কর। 'না, কোথায় মুখ ভার দেখছেন? I am young man of twenty.'

'না ডাক্তারবাবু, এমন আপনাকে দেখিনি অনাদিন। তা দিবেদর চিঠি-টিঠি পাচ্ছেন তো ? খবর সব ভালো নিশ্চয়ই।'

ডাক্তার করের মুখের আলো নিভে যায়। 'আপনার বৌদির চিঠি পাইনি। তবে 'আমার শ্বশুরের চিঠি পেয়েছি আজ। ওর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না লিখেছে। মাথা ঘোরে নাকি দিনরাত। ভালো ডাক্তার দেখানো হয়েছে! বলছে নাকি ব্লাডপ্রেসার—লো! কিডনীর কমপ্লেকসনও ( complaint ) আছে। আমাকে একবার যাবার জন্য লিখেছেন।'

'যাননা বৌদিকে একবার দেখে আসুন। হঠাৎ ও'র এ রকম হল'--

মুখের কথা কেড়ে নেন ডাঃ কর। 'না, শ্বশুরবাড়ী আমি যাবো না।'

'কেন ?'

'আমার শ্বশুর লোকটাকে আমি তেমন পছন্দ করি না। পাঁচ বছর আগে আমি শেষ গেছি বুঝলেন। তখন লোকটা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি।'

'সে আবার কি ?' আপনার সকৌতুক প্রশ্ন।

'আর বলবেন না স্যার। লুঙ্গি পরেছিলাম বলে শ্বশুরের রাগ—ওটা নাকি তিনি পছন্দ করেন না। অবশ্য ও'কে একদিন সিগারেট অফার করে ছিলাম। কিন্তু এটা আর এমন কি দোষের বলুন ?'

আপনি ডাক্তারের কথায় বহুকষ্টে হাসি চাপেন। বলার মত আপনার কিছু নেই।

ডাক্তার বিমল করের মুখের ঔজ্জ্বল্য দিনকে দিন কমতে থাকে। সদা হাসি খুশী মানুষটার ভিতরে নিয়ত দহন যে চলছে আপনার চোখেও ধরা পড়ে। আপনার কষ্ট লাগে খুব। আপনি কোনদিনও আশা করতে পারেননি এমন মানুষটাকে দুঃখের আগুনে পুড়তে হবে।

সেদিন মুখের স্বাভাবিক রং নিয়ে ডাক্তার বিমল করের আগমন হয়! উচ্ছ্বসিত আনন্দে ডাক্তার বলেন, 'আজ ফাউলিং হোক, স্যার।'

ডাক্তার করকে দেখে আপনারও ভালো লাগে খুব। 'ফাউলিংটা কি জিনিস, ডাক্তারবাবু ?'

'আপনি স্যার, এতদিনেও এডিনবার্গের ইংরাজী বুঝলেন না। এটা বড়ই দুঃখের কথা। 'ফাউলিং হোক মানে আজ মুরগী হোক।'

হো হো করে অনাবিল আনন্দে আপনি হাসেন ডাঃ বিমল করের সঙ্গে।

'কেন ডাক্তারবাবু, আজ কি হল এমন যার জন্য ফাউলিং হবে ?'

'চিঠি পেলাম ২৭শে তারিখে ওরা আসছে। শরীর ভালো নেই, সেজন্যই বোধহয় চলে আসছে।'

'তাই নাকি ? এতো খুব ভালো খবর।' আপনি বলেন, 'বৌদি আপনাকে চিঠি দিলেন তাহলে ?'

'আমাকে দেননি। কম্পাউন্ডারবাবুকে জানিয়েছে ঘর দোর যেন পরিষ্কার করিয়ে রাখে।'

'সেকি আপনাকে চিঠি লিখলেন না কেন?'

'আমাকে লিখে কি লাভ! আমার দ্বারা ওসব হবে না ও জানে। ও খুব intellectual, বুঝলেন স্যার!'

নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তার বিমল কর সাজগোজ করলেন খুব। ঝকঝকে সিল্কের শার্ট ও দামী রেয়নের প্যান্ট ওঁর মুখের হাসির সঙ্গে ঝিকিয়ে উঠল।

'কি, ডাক্তারবাবু, কোথায় চললেন সেজে-গুজে?'

একগাল হাসলেন ডাঃ কর। 'ওদের আনতে স্টেশনে যাচ্ছি। গুড নাইট স্যার।' ডাক্তার চলে যান।

ডাক্তারের মনের হাসি মুখে ফুটে উঠেছে। আপনিও খুশী ডাক্তারের খুশীতে।

সেদিন আর ডাঃ বিমল কর আপনার কাছে আসলেন না। তার পরদিনও না। আপনি ভাবলেন ডাক্তার-গৃহিণীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে পুঞ্জীভূত গৃহ-সংসারের এলোমেলো ভাব দূর করতে ডাক্তারের হয়ত ঝামেলা বেড়েছে, কিংবা হয়ত দুর্বল স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করতে ওঁর মন চাইছে না। কিন্তু তৃতীয় দিনও যখন ডাক্তার আসলেন না তখন আপনি দুশ্চিন্তায় পড়লেন। এমনটি তো ডাক্তারের কখনও হয়নি। তবে কি ডাক্তার গিন্নীর রোগের বাড়াবাড়ি! সন্ধ্যার পর আপনিই চল্লেন ডাক্তার করের বাড়ী—ওঁর খোঁজটা নেওয়া একান্ত দরকার।

ডাক্তারের বাড়ীর সদর দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। আপনি ঢুকতে যাবেন এমন সময় আপনার কানে এলো একটা অবরুদ্ধ কান্নার আওয়াজ। কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে ভিতরে। কে কাঁদছে? গলা শুনে তো মনে হয় ডাক্তার গৃহিণী। কেন কাঁদছেন উনি? রোগ যন্ত্রণায়? আরো দু'পা এগোন আপনি।

ডাক্তার বিমল করের চাপা গর্জন এবার কানে এল আপনার। 'নাও এখন কেঁদে কি হবে? তখন বারবার বলেছিলাম ও ছোঁড়াকে বাদ দাও—তুমি শুনলে না কিছুতেই। হারানো ভাইয়ের মায়ায় গলে গেলে। এখন তোমার ভাইকে ডাকো, সে তো ফেরার।'

আপনি অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন দারুণ। কার কথা বলছেন ডাঃ কর! প্রদ্যোতের! সংশয় আপনার দূরে গেল শীঘ্রই। রোরুদ্যমানা ডাক্তার-গৃহিণীর কথা শুনতে পেলেন। 'প্রদ্যোৎকে পাওয়া গেল না?'

আপনার বিস্ময় আকাশচুম্বী হয়। কিন্তু নিজেকে সংযত করেন আপনি। ওঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনার কোনো ঔৎসুক্যকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত মনে করেন না। আপনি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে আসেন।

পরদিন ভোর হতে না হতেই আপনার চাকর আপনাকে ঠেলে তুলল।
'বাবু, ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে কি যেন হয়েছে।'

আপনি আর কিছু শোনেন না। শোনার প্রয়োজন বোধ করেন না। জামাটা কোনমতে গায়ে গলিয়ে দৌড়ে যান ডাক্তার করের বাড়ী। বাড়ীর বাইরে অনেক লোকের কথাবার্তা শুনতে পান। পুলিশের লোকও দেখেন। একটা বিশ্রী দুশ্চিন্তা আপনার মাথায় পাক খায়। কোনোমতে দু হাতে ভীড় ঠেলে ভিতরে ঢোকেন।

ভিতরেও অনেক লোকের ভীড়। সে ভীড়ের মাঝে যে দৃশ্য দেখেন তাতে আপনার আপাদমস্তক শিউরে উঠে অবশ হয়ে যায়। বারান্দায় ডাক্তার করের একমাত্র মেয়ে মীরাকে শোয়ানো আছে। ওর চোখের তারা দুটো বিস্ফারিত। যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ফর্সা গলায় আধময়লা শাড়ীটা তখনও চেপে বসে আছে।

ঘরের ভিতরের মেঝেয় ডাক্তার গৃহিণী পড়ে আছেন। আপনি তড়িতে ওঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখেন গা বরফের মত ঠাণ্ডা।

ভয়ে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায়, প্রচণ্ড দুঃখে আপনি এদিক ওদিক তাকান। ডাক্তার কোথায়! ডাক্তার বিমল কর! চারধারে লোক, ডাক্তার করকে আপনি খুঁজে পান না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই থানার বড়বাবু যখন মীরার ইন-কোয়েস্ট শুরু করলেন তখন প্রচণ্ড হাসির গমকে সকলের সঙ্গে আপনিও চমকে উঠলেন। কে হাসছে! কে এমন উন্মাদের মত হেসে চলেছে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

*　　*　　*　　*

আপনার ঘুম ভেঙে যায়। নীলকুঠিডাঙ্গায় পাঞ্জাবী ট্রাকের ধাক্কায় আহত পাগলটার সঙ্গে আপনার মনে হয় ডাক্তার বিমল করের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে।

# ছেলেটা

'দশটা পয়সা দেবে ! বৌদিকে দেবো ।'

এক মনে বি. ই টু রেজিস্টারে পোস্টিং করছিলাম ।

আশেপাশে সহকর্মীরা নানারকম আলাপ-আলোচনা করছিলেন । কাজে অত্যন্ত ব্যাঘাত হচ্ছিল । রোজই হয় । তবু আজ ঠিক করেছিলাম ডিসেম্বর মাসের পোস্টিংটা যেমন করেই হোক শেষ করব । এ্যাকাউন্টস অফিসার এবং জেলা ম্যানেজার দুজনেই তাড়া লাগাচ্ছিলেন । প্রতি বছরই নাকি পশ্চিম-বাংলার জন্য গোটা কর্পোরেশনের এ্যাকাউন্টস আটকে থাকে । সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে এতে কলকাতা রিজিয়নের তথা বাঙালীদের লজ্জা । তাই ঠিক করেছিলাম যেমন করেই হোক আজ ডিসেম্বর মাসের পোস্টিংটা শেষ করব ।

'দশটা পয়সা দেবে ! বৌদিকে দেব ।'

আবার বাধা । জোর করে লেজার থেকে মুখ তুললাম । টেবিলের সামনেই একটি ছেলে দাঁড়িয়ে । কত বয়স হবে ! ষোলো-সতের । নাকি আরো বেশি ! ক্যারাণ্ডে মার্কা বলে বয়স ঠিক ঠাওর হয় না । নোংরা ছেঁড়া জামা গায়ে ছেলেটার । অবিন্যস্ত চুল ! ওকি বলছে বুঝতে পারিনি ঠিক । জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাই তাকালাম ।

'দশটা পয়সা দেবে । বৌদিকে দেব ।'

কেমন অস্পষ্ট ভাঙ্গা-ভাঙ্গা আউড়ানো-আউড়ানো কথা । মনে হয় ওর মুখের মধ্যে জিভটা ভালো করে নড়ছে না । অবাক হলাম । ছেলেটা পয়সা চাইছে । সে তো অনেকেই চায় । কিন্তু এ আবার কি ! পয়সা নিজের জন্য চাইছে না । বৌদিকে দেবে বলে চাইছে ।

'বৌদিকে পয়সা দেবে ? কেন ?'

ও উত্তর দিল না কিছু । বোবা দৃষ্টিতে আমার দিকে একটু তাকিয়ে রইল ! তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে আড়ষ্ট জিভে ওর বাঁধা গৎ আউড়ালো—'দশটা পয়সা দেবে ! বৌদিকে দেব ।'

আমি আর ঘাঁটালাম না । পকেট থেকে একটা কুড়ি পয়সা বার করে ওর প্রসারিত হাতে দিলাম । একটা দশ পয়সা আমার সামনে নামিয়ে দিল ও । ওর মুখে-চোখে কোন ভাব পরিবর্তন দেখলাম না । কুড়ি পয়সাটা নিজের পকেটে ফেলে পাশের সহকর্মীর টেবিলের সামনে দাঁড়াল। তারপর হাতটা অল্প বাড়িয়ে জড়ানো-জড়ানো গলায় বলল, 'দশটা পয়সা দেবে । বৌদিকে দেব ।'

সহকর্মীর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ঘরের তৃতীয় কর্মীর কাছে গিয়ে একই আর্জি জানালো। এমনি করে ঘরের সব ক'জনের টেবিল ঘুরে এক সময় বেরিয়ে গেল।

বি. ই. টুর পাতায় মন বসছিল না। ছেলেটাকে দেখে বিচিত্র লাগল। আরো বিচিত্র লাগল ওকে কেউ প্রত্যাখ্যান করল না দেখে।

'কে ছেলেটা বলুন তো! ভারী অদ্ভুত!' পাশে বসা অল্প বয়সী কর্মীবন্ধুকে প্রশ্নটা করলাম।

সহকর্মী হাসল—'ও প্রত্যেক মাসেই একবার করে আসে। মাসের প্রথম দিকেই আসে। আর প্রত্যেকের কাছ থেকেই পয়সা নিয়ে যায়। শুধু কি আমাদের অফিসেই আসে! জলপাইগুড়ির প্রত্যেকটি অফিসেই যায় এবং প্রায় প্রত্যেকের কাছ থেকেই ওর বরাদ্দ নিয়ে যায়। তবে দশ পয়সার বেশি নেয় না। বেশি দিলেও নেয় না। আর মাসে একবারই নেয়। একমাসে দুবার ওকে কখনও আসতে দেখিনি!'

এ শহরে আমি একেবারে আনকোরা। বদলী হয়ে ক'দিনমাত্র এসেছি। আমার কাছে অভিজ্ঞতাটা নতুনই লাগল। একটু অবাক হলাম তাই।

ছেলেটার কথা ক'দিনেই ভুলে গেলাম। কেই বা সামান্য একটা ভিখারির কথা মনে রাখে!

কিন্তু ওকে ভোলা গেল না। পরের মাসে আবার ও হাজির হল।

'কুড়িটা পয়সা দেবে। বৌদিকে দেব।' আড়ষ্ট গোঙানির মতো কথা। এবার যেন অনেক বেশি ক্লান্ত আর অস্পষ্ট।

ভীষণ অবাক হলাম। গতমাসে তো দশ পয়সা চেয়েছিল। কুড়ি পয়সা দিলেও দশ পয়সা ফেরত দিয়ে গিয়েছে। তবে এবার কুড়ি পয়সা চায় কেন! জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর দিল না কিছু।

'তোমার নাম কি?'

উত্তর নেই। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি?'

বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ছেলেটা। আস্তে-আস্তে মুখের ভিতর ওর জিভটা নড়ে উঠল—'জানি না!'

'জানো না! সে কি কথা! নিজের নাম জানো না তাই কখনও হয় নাকি!'

ছেলেটা নিরুত্তর। চোখ দুটো কেমন ছলো-ছলো লাগল। আমার কেমন মায়া লাগে।—'তোমার নাম বলো না।'

'জানি না। বৌদি ডাকে মণি।'

বিচিত্র ছেলেটি তো! দিব্যি নিজের নাম জানে তবু বলছে জানি না। কৌতূহল বাড়ল আমার।

'গতবারে দশ পয়সা চেয়েছিলে। এবার তবে কুড়ি পয়সা চাইছ কেন?'

ছেলেটির মুখটা কেমন পাংশু হয়ে গেল। দু'চোখের স্থির চাহনিতে

একটা বোবা কান্না জমাট বাঁধছে যেন। মুখের মধ্যে ওর জিভটা আড়ষ্টতা কাটাতে চাইছে মনে হল। জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বলল বুঝতে পারলাম না।

'তোমার কথা বলতে খুব কষ্ট হয় বুঝি?'

মণি এবারও নিরুত্তর। ওর দুটি চোখের কোণে দু'ফোটা মুক্তো টলটল করে উঠল শুধু।

কথা বাড়ালাম না। একটা কুড়ি পয়সা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। বেশি দিলাম না। দিলেও ও নেবে না সম্ভবত।

মণি পয়সাটা নিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই গেল না। আমার মুখের দিকে ওর বোবা চোখ দুটো মেলে ধরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'বৌদির অসুখ।'

একটা কালো ছায়া ওর সমস্ত মুখে নামল। চোখের কোণের টলায়মান মুক্তো বিন্দুর মুক্তিতে আমার মনে হল বিষাদ ম্লানিমার এর চেয়ে সুস্পষ্ট রূপ আমি দেখিনি কখনও।

মণি চলে গেল।

কিন্তু ওকে ভুলতে পারলাম কই! আমার সকল অন্তকরণে ও যেন একটা বিষণ্নতার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেল। কৌতূহলী হলাম।

এই শহরে আমার স্বল্প পরিচিত জগতে কিন্তু কেউই মণির ব্যাপারে আমার জানার বাইরে নতুন কিছু বলতে পারল না।

পরের মাসে আবার মণি এলো। আরো জীর্ণ চেহারা হয়েছে ওর। বড় বড় চোখগুলো বসা-বসা। সারা মুখে কালি মাখা! গায়ের জামাটা শত ছিন্ন।

'একটা টাকা দেবেন। বৌদিকে দেব।'

একটা টাকা! প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। প্রত্যেক মাসে মণির চাহিদা বাড়ছে কেন! জিজ্ঞাসা করলাম। অনুভূতিহীন ভরা দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল মণি। ওর চোখের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। ও দুটোয় এবার ছলো-ছলো ভাব নেই। কেমন শুকনো, রুক্ষ! একটা জ্বালা ধরা চাহনি সেখানে। মনে হল ওর চোখে আগুন। না। আগুন নেই। শুধুই শুকনো, রুক্ষ, বোবা চাহনি।

'তোমার বাড়ি কোথায় মণি?'

জড়িয়ে-জড়িয়ে উত্তর দিল, 'রং ধামালী।'

'সে তো শহরের বাইরে।'

মাথা নাড়ল ও।

'তোমার মা আছেন?'

মাথা নাড়ে মণি। না নেই।

'বাবা?'

মণি আবার মাথা নাড়ে।

'ভাই বোন ?'

একই উত্তর। না।

'দাদা কি করেন ?'

ছাদের দিকে তাকাল মণি। দাদা বেঁচে নেই।

'দাদার ছেলে মেয়ে ?'

আস্তে-আস্তে জড়ানো-জড়ানো আড়ষ্ট কথা মণির—'দু' ছেলে।'

'কত বড় ?'

মণি হাত নেড়ে দেখাল। ওর চেয়ে অনেক ছোট।

'তোমার বৌদি কেমন আছে ?'

মণি এবার উত্তর দিল না। চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তারপরই জলে গেল। শ্রাবণের মতো হঠাৎই একটা জলভরা মেঘ ভরে ওর শীর্ণ মুখখানাকে ঢেকে দিল।

'অসুখ।' অস্ফুটে মণি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে।

'তোমার বৌদিকে তুমি খুব ভালোবাসো, না ?'

মণি আমার মুখের দিকে তাকাল। একটু চুপ করে থাকল। তারপর বিনা ভূমিকাতেই দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। মনে হল ও যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ঘরে সহকর্মীরা কেউ ছিল না। টিফিনে গেছে। এখনও ফেরেনি। বোধহয় ক্লাব-ঘরে তাসের আড্ডায় বসেছে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। অসীম মমতায় মণির রুক্ষ চুলে হাত দিলাম। তারপর দুহাত বাড়িয়ে ওকে তুলে ধরলাম।

'বোসো, মণি, এই চেয়ারটায় বসো।' পাশের চেয়ারটা ওকে দেখালাম।

মণি বসল না। ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। আমি ওর হাতে একটা টাকা দিলাম।

টাকা নিয়েই মণি গেল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

'যে কথা আর কোনো বাবু জানে না আপনাকে তাই বলছি। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না। শুনে সবাই হাসে, ঠাট্টা করে—' ছাড়া ছাড়া অগোছালো কথা। বক্তব্যও এলোমেলো। অনেক কষ্টে যা বুঝলাম তা গুছিয়ে বললে যা দাঁড়ায় তা নিজের কথায় নীচে দিলাম।

'আমার জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মা মারা যায়। বৌদিই আমাকে মানুষ করেছে। বৌদিই তাই আমার মা। জন্ম থেকে আমি কথা বলতেও পারতাম না। তবে সব কথা বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমি কথা বললে গোঙানির মত শোনাতো শুধু।

দাদার ছেলে হবার পরও বৌদি আমায় নিজের ছেলের মতই দেখত।

দাদা কিন্তু আমায় দেখতে পারত না, প্রায়ই মারত। বোবা বলে বৌদির যতই আদর বাড়ত, দাদা ততই মারত আমায়।

'দাদাকে এক রাত্রে কারা পিছন থেকে এসে ছোরা দিয়ে মেরে ফেলল। দাদার রক্তমাখা দেহটা যখন বাড়িতে নিয়ে আসল, বৌদি তখন বুকফাটা একটা প্রচণ্ড আর্ত চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। বৌদির দুঃখ, বৌদির আর্ত চিৎকার, বৌদির কান্না আমার ছোট্ট বুকটাকে ভেঙ্গে যেন খান-খান করে দিল। একটা অসহ্য যন্ত্রণায় আমার অন্তরাত্মা বিদীর্ণ হয়ে যেতে চাইল। বৌদির সব দুঃখটুকু আমি নিঃশেষে নিংড়ে নিতে চাইলাম। কিন্তু সে তো আর পারা যায় না। এই সময় কান্নার গোঙানির মধ্যে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম আমি কথা বলতে পারছি। অল্প কথা, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা, জড়ানো, অস্পষ্ট, আড়ষ্ট, প্রথমটা জিভ নাড়ানোই যায় না, তবু আমি কথা বলতে পারি।

দাদার মৃত্যু আমার মুখে ভাষা জুগিয়েছে। আমি বৌদিকে তাই ভরসা দিয়েছি ওর দায়িত্ব, ভাইপোদের দায়িত্ব আমার। তাই আমি ভিক্ষা করি।'

ডায়েরীর ভাঁজে রাখা দশ টাকার নোটটা মণির দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

'তোমার বৌদিকে ভালো ডাক্তার দেখিও।'

মাথা নাড়ল মণি। টাকাটা নিল না। ডান হাতটা উঠিয়ে কপালে ঠেকাল একবার। তারপর মাথা নীচু করে ঘরের বাইরে চলে গেল।

এর পরের মাসে মণি এল না। তার পরের মাসেও না। তৃতীয় মাসেও যখন মণি এল না তখন খোঁজ নিলাম, কোনো অফিসেই মণি এ তিন মাসে যায় নি। আশ্চর্য হলাম খুব।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে এক রবিবারে রংধামালী গেলাম। নানা লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ জানেনা মণি কোথায় গেছে। শুধু জানলাম ওর বৌদিকে ও বাঁচাতে পারেনি। আর সেই থেকেই ও নিরুদ্দেশ।

তবু মণির দেখা পেলাম। অনেক, অনেক দিন পরে। অফিসের কাজে আলিপুরদুয়ারে যেতে হয়েছিল। কাজ শেষে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছিলাম। চৌপথী পার হয়ে খানিকটা চলে এসেছি হঠাৎ একটি দোকানের সামনে বিবর্ণ বিশীর্ণ একটি ছেলেকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। মণি না! হ্যাঁ, তাই তো। আগের চেয়ে আরো রোগা। মুখে অল্প অল্প দাড়ি জন্মেছে। চুলগুলোয় ধুলো ভর্তি।

'মণি!' আমি ডাকলাম।

আমার দিকে তাকিয়ে মণি একটু হাসার চেষ্টা করল। বুঝলাম চিনতে পেরেছে।

'মণি, তুমি এখানে?'

জবাব নেই।

'কেমন আছ তুমি ?'

জবাব নেই এবারও। মণির দৃষ্টি যেন ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে।

'তোমার দাদার ছেলেরা কোথায় ? কেমন আছে ওরা ?'

কোনো উত্তর নেই। মুখের ভিতর ওর জিভের নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ নেই! অধীর হয়ে উঠলাম। বাস ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। জলপাইগুড়ি ফেরার শেষ বাস।

'কথা বলছ না কেন ? কথা বল মণি!'

এবারও কথা বলল না মণি। চোখ দিয়ে শুধু ফোটায়-ফোটায় জল গড়িয়ে পড়ল।

সামনের দোকানদার এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলেন আমাদের। একটু হেসে আমায় বললেন, 'কথা বলবে কি করে ? ও তো বোবা।'

মণি বোবা! আমি আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলাম, 'সেকি! ওতো কথা বলত!'

'কি জানি মশাই! এখানে আছেও তো বেশ কিছুদিন। মাসে একবার দু'বার আসেও। পয়সা চায় কিন্তু কথা বলতে তো শুনিনি ওকে কখনও।'

মণি বোবা! মণি আবার বোবা হয়ে গেছে! মনটা হায়-হায় করে কেঁদে উঠল। ফিরে তাকালাম ওর দিকে। কোথায় ও! ও নেই। চোখ ঢেকে ও খুব তাড়াতাড়ি চৌপথী ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

যাক। মণি যাক। মণির বোবা কান্নার অংশীদার তো হতে পারব না। তবে যন্ত্রণা বাড়িয়ে কি লাভ!

মাথা নীচু করে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোলাম। জলপাইগুড়ির বাস তখন ছেড়ে যাচ্ছে।

# যযাতির কান্না

জানালার ধারে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে রাস্তার দিকে দু'চোখ মেলে বসে-ছিলেন অবিনাশবাবু। বিকালশেষের আলো পথ-চলতি লোকগুলোর চোখে-মুখে পড়ে অপরূপ বর্ণারোপ করছিল। উদাস প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে অস্তমান সূর্যের বর্ণ-বিন্যাসকে তারিয়ে তারিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলেন অবিনাশ-বাবু। সন্ধ্যা হয়নি এখনও। তবু রাজপথের আলো জ্বলে উঠেছে কৃত্রিম রাতের আগমনী শুনিয়ে।

অবিনাশবাবুর চোখ পড়ল রাস্তার ওপারের দোতলা বাড়িটার জানালার দিকে। জানালায় টাঙানো নতুন রঙিন পর্দা হাল্কা বাতাসে খানিক উড়ে উড়ে যাচ্ছে। ঘরের ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছে! সেই আলোয় অবিনাশ-বাবু যা দেখতে পেলেন তাতে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। তিনি দেখলেন সামনের বাড়ির নতুন বিয়ে হওয়া ছেলেটার চওড়া বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে হাসছে একটা ঝলমলে শাড়ি-গয়না পরা মেয়ে। মেয়েটাকে দেখেই বোঝা যায় যে তারও নতুন বিয়ে হয়েছে। ও কি, ছেলেটা আবার কি করছে! দু'হাতে মেয়েটার মুখটাকে জোর করে তুলে ধরেছে। মেয়েটার মুখটা যেন ফুটন্ত পদ্মের মত ছেলেটার দিকে তোলা। তার ডাগর চোখ দুটি আধফোটা কমল পাপড়ির মত। আরে এ কি, ছেলেটা যে নিজের মুখটাকে নিচের দিকে নামিয়ে মেয়েটার ঠোঁট দুটোকে প্রাণপণে চেপে ধরেছে। নাঃ, এ ছেলেমেয়ে-গুলোর কোন লজ্জাই নেই। অবিনাশবাবু মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

একান্ত পরিচিত সরু রাস্তাটির প্রবহমান জনস্রোত দেখতে অবিনাশ-বাবুর একটুও ভাল লাগল না। এতক্ষণে দিনশেষের মায়াময় রং অদৃশ্য হয়েছে। রাস্তার কড়া আলোগুলোর মুখে দেঁতো হাসি। অবিনাশবাবুর ক্ষণপূর্বের প্রসন্নতা অসীম বিরক্তিতে হারিয়ে গেল। বিরক্তির সঙ্গে একটা জ্বালাও যেন শুরু হয়েছে শরীরটার কোণে কোণে। কোন্ এক দুরন্ত আকর্ষণে অবিনাশবাবু আবার তাঁর দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনলেন সামনের বাড়ির দোতলার ঘরে।

এবারকার দৃশ্য আরো অসহ্য লাগল অবিনাশবাবুর কাছে। সামনের বাড়ির চোয়াড়ে ছেলেটা শালীনতার সংজ্ঞাকে ভুলে গিয়ে বেহায়া মেয়েটার গায়ের জামা ধরে টানাটানি করছে। লজ্জার মাথা খেয়ে মেয়েটাও হেসে হেসে লুটিয়ে পড়ছে ছেলেটার গায়ের উপর। না, এ দৃশ্য অসহ্য। কোন ভদ্রলোকের

পক্ষেই আর দেখা সম্ভব নয়। সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন অবিনাশবাবু।

উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ঘরের সামনের খোলা জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেন অবিনাশ-বাবু। কোটি কোটি কালকেউটে যেন তাঁর ষাট বছরের পুরাতন শরীরটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তীব্র বিষ ঢেলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এমনি জ্বালাই অনুভব করতেন তিনি তাঁর প্রথম যৌবনের দিনগুলোতে যখন মনোরমার সারা দেহে কুসুমিত যৌবন অজস্র বিস্ময় নিয়ে এসে গেছে। তখন অবিনাশবাবুর কত বয়স! পঁচিশ কিংবা ছাব্বিশ। আর মনোরমা? সে-ও সতেরো অথবা আঠারোতে পা দিয়েছে। অবিনাশবাবুর মনে পড়ল মনোরমার দেহলতা তাঁর নিজের চোখের সামনেই পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল। মনোরমার সঙ্গে সে সময় তাঁর দেখা হত সপ্তাহান্তে। শনিবারের সেই রাত্রিগুলো সারা দেহে-মনে আজকের মতই বিষমাখানো জ্বালা নিয়ে অবিনাশবাবুকে উন্মাদ করে দিত। হয়তো বা সে জ্বালা ছিল আজকের চেয়েও বহুগুণে তীব্র। কিন্তু সে জ্বালার শেষ ছিল। রবিবার সকালে ঘুম ভাঙত অদ্ভুত আনন্দের মধ্যে। মনোরমার নরম দেহটাকে বুকের মধ্যে পিষে ফেলে তার সবটুকু সুধা নিংড়ে সমুদ্র-মন্থনের অমৃতে তাঁর হৃদয়-মন ভরে উঠত। সেই পূর্ণতার স্পর্শ নিয়ে কলকাতায় নতুন চাকরিতে আবার যখন ফিরে আসতেন সোমবার সকালে, তখন সারা দেহের কোথাও বিষের জ্বালা আর নেই, পরিবর্তে আসত একটা অবসন্নতার ভাব।

অবিনাশবাবুর মনে পড়ে তিনি গত দশ বছর বিপত্নীক। দীর্ঘ দশ বছর আগে মনোরমা তাঁকে ছেড়ে চিরবিদায় নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ মনোরমা যদি তাঁর পাশেই থাকত তাতেই বা কি লাভ হত! পঞ্চাশোর্ধ মনোরমা কি আজ পারত অতীত দিনগুলোর মত অবিনাশবাবুর দেহ-মনের সমস্ত জ্বালা হরণ করতে? বোধ হয় না? তাঁর চোখে ভেসে ওঠে সামনের বাড়ির দোতলার নতুন বউটার তনুদেহের ছবি—যৌবনের অর্ঘ্য যেন সেখানে থরে-বিথরে সাজানো। এই দেহের সঙ্গে যৌবনোত্তীর্ণা মনোরমার নীরস মেদবহুল স্থবির শরীরের কল্পনা তাঁকে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত করতে পারল না!

চমক ভাঙল অবিনাশবাবুর। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে কে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে। ও সুলতা, মানে বৌমা। তাঁর একমাত্র ছেলের বৌ। যাচ্ছে সম্ভবত নীচে—রান্নাঘরের দিকে। দীঘল দেহের গড়ন; হাল্কা-নীল রংয়ের শাড়িটা কুঁচি দিয়ে পরা বেশ আঁটসাঁট ভাবেই। গুরুনিতম্ব চলার ছন্দে নৃত্যরতা। লো-কাট্ ব্লাউজের নীচে কোমরের উপরের পেলব অংশটুকু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! সব মিলিয়ে মোহ জাগায়। হঠাৎই বিরক্ত হলেন অবিনাশবাবু। আজকালকার মেয়েরা এমন দেহের সঙ্গে আঁট করে কাপড় পরে কেন? ব্লাউজেরই বা কি ছিরি! কই, তাঁদের কালে মেয়েরা কেউই

তো এমন ধরনের শাড়ি-জামা পরত না। সাদাসিধে ভাবে কাপড় পরত তারা যার মধ্যে পুরুষের মনে কামনা জাগাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ পেত না। আর আজকাল। ধ্যেৎ।

সামনের দিকে সিঁড়িতে আওয়াজ পেলেন অবিনাশবাবু। ট্যারছা ভাবে দেখলেন, আগে আগে উঠছে তাঁর ছেলে কমলেশ, পিছনে সুলতা। তাহলে নীচে গিয়েছিল দরজা খুলে কমলেশকে আনবার জন্য। এতক্ষণ তাহলে সে কমলেশের প্রতীক্ষাতেই ছিল। একটা কটু ভাবে অবিনাশবাবুর মন বিস্বাদ হয়ে ওঠে। বিরক্তির সঙ্গে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন তিনি।

বাবাকে এমনিভাবে দেখে কমলেশ বোধহয় খুশি হল। চোখাচোখি হলেই কিছু কথা বলতে হত। নিঃশব্দে সে তার ঘরে ঢুকে পড়ল। অবিনাশবাবু টের পেলেন বৌমাও তার পিছনে পিছনে গেল। আর ওরা যেন ওদের ঘরের দরজাটাও আলগোছে বন্ধ করে দিল।

পরের দিন সুলতার ডাকে অবিনাশবাবুর যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়েছে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। এত বেলায় তিনি তো কখনও ওঠেন না। তাঁর কি হয়েছে। সুলতার মুখেও সেই প্রশ্ন, আপনার শরীর ভাল আছে তো বাবা? কাল রাত্রে আপনাকে কতবার ডাকলাম, আপনি উঠলেন না। খাবেন না বলে আবার শুয়ে পড়লেন।

—শরীরটা ভালো ছিল না মা। অপ্রস্তুতের হাসি হাসেন অবিনাশবাবু। ধীরে ধীরে তাঁর মনে পড়ে গত সন্ধ্যা আর রাত্রির কথা। মনে পড়ে আর লজ্জায় তিনি অধোবদন হয়ে যান।

—আপনার চা এনেছি বাবা। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে নিন, নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম নামাতে নামাতে সুলতা বলে।

অবিনাশবাবু ওর দিকে চান। তাঁর দৃষ্টিতে করুণা মাখা। অসীম মমতার ভারে সে দৃষ্টি সজল। কি সুন্দর দেখাচ্ছে সুলতাকে। এই সকালে স্নান করে নিয়েছে। পিঠের ওপর একরাশ ভিজে চুল ছড়ানো। কপালে নতুন সূর্যের মত সিঁদুরটিপ জ্বলজ্বলে। খুব ভালো লাগে অবিনাশবাবুর। মনে পড়ে নন্দিনীর কথা। তাঁর ও মনোরমার একমাত্র কন্যা। কিন্তু সে আজ কোথায়! মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই সে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। বেঁচে থাকলে আজ সে-ও সুলতার মত কোন ঘর আলো করত। বয়সেও তো প্রায় সুলতার মতই হত। সুলতার মুখে তিনি যেন নন্দিনীরই ছায়া দেখেন। গভীর স্নেহে তিনি সুলতাকে অভিষিক্ত করেন।

—পাগলী মা, বুড়ো ছেলের জন্য কত ব্যস্ত! কিন্তু মা, তুমি নিজে কি চা খেয়েছ।

—এইবার খান বাবা।

—কমলেশ কোথায়? তাকে চা দিয়েছ তো?

—উনি তো চা খেয়েই বাজারে গেছেন।

—এত সকালে বাজারে গেছে?

—হ্যাঁ বাবা। আজই তো ওঁর কানপুর যাবার কথা অফিসের কাজে। দশটার ট্রেন ধরতে হবে আবার।

—ও হ্যাঁ, তাই তো। এই দেখ মা, বুড়ো হয়েছি বলে সে কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি যাও, ওর জিনিসপত্র সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে দাও। গরম-জামাকাপড়গুলো নেয় যেন। ওদিকে এখনও বেশ ঠান্ডা আছে।

সুস্মিত মুখে সুলতা চলে যায়। পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে অবিনাশবাবুর আবার গত সন্ধ্যা ও রাত্রের কথা মনে পড়ে। বেদনাভরা সঙ্কোচে তিনি কিমুটে হয়ে যান। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটল কেন! তাঁর ষাট বছরের জীর্ণ দেহটার কোটরে কোটরে এমন বিষ লুকিয়ে ছিল কেমন করে—ভাবতে ভাবতে তিনি নিথর হয়ে যান।

বিকালের আলো নিভু-নিভু হয়েছে। সান্ধ্যভ্রমণে যাবার আগে অবিনাশবাবু তাঁর প্রিয় জানালাটার ধারে এসে দাঁড়ান। চোখে পড়ে জানালাটার নীচে রাজপথে জনস্রোতের অবিরাম প্রবাহ। মনটা কেমন উদাস লাগে। কমলেশ চলে গেছে আজ সকালে। তুফান এক্সপ্রেস কানপুরের পথে না জানি কতদূরে গেছে এতক্ষণে!

চোখ ফেরান অবিনাশবাবু। সামনের বাড়ির দোতলার জানালার রঙীন পর্দার উপর দৃষ্টি আছড়ে পড়ে। আজ সারাদিন অজস্রবার সতৃষ্ণ নয়নে তিনি পর্দা-ঘেরা রহস্যময় ঐ জানালার দিকে তাকিয়েছেন। কিসের যেন প্রত্যাশা তাঁকে প্রতিবারই ব্যাকুল করেছে। কি এক অদ্ভুত দৃশ্যের সম্ভাবনা তাঁর ঠান্ডা রক্তে প্রতিবারই ঝড়ের দোলা জাগিয়েছে। কিন্তু কিছুই তো তিনি দেখতে পাননি। প্রতিবারই জানালা ঢাকা রঙীন পর্দা তাঁর দিকে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছে।

কিন্তু এবার বোধহয় ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ঐ তো পর্দা সরে গিয়েছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে নতুন বৌটা খাটের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে কি যেন পড়ছে। বেশ মিষ্টি মুখ তো বৌটার। গতকাল ভালো করে দেখেন নি, আজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন অবিনাশবাবু।

কিছু সময় গেল। ঘরে কে যেন এসেছে। ঐ তো সেই ছেলেটা। এখনি তাহলে আবার শুরু হবে নির্লজ্জ কদাচার। মনে ঘৃণার ভাব আনতে চেষ্টা করেন অবিনাশবাবু। তবুও কেন যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। রক্তে যেন আগুন ছড়াচ্ছে কে!

এ কি, আচ্ছা অসভ্য তো ছেলেটা! সে বৌটার সঙ্গে কি বলতে বলতে

জানালার মোটা পর্দা টেনে দিল। রাগে লাল হয়ে উঠল অবিনাশবাবুর মুখ। এক মুহূর্তে তাঁর মনে হয় লক্ষ লক্ষ বিষাক্ত সাপ তাঁর সারা দেহে কিলবিল করে উঠল। তাদের পিচ্ছিল ঠাণ্ডা স্পর্শে সারা দেহের প্রতিটি স্নায়ু যেন প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। পাঞ্জাবিটা একটানে খুলে ছুঁড়ে দিলেন আলনাটার উপর। তারপর টান্ টান্ হয়ে শুয়ে পড়লেন নিজের বিছানায়।

ঘরে ঢোকে সুলতা। হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালতে যায়। নিষেধ করেন অবিনাশবাবু! আলো জ্বেলো না।

—এমন অসময়ে শুয়ে আছেন বাবা? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি? উদ্বিগ্ন প্রশ্ন সুলতার।

—না, এমনিই শুয়ে আছি।

আশ্বস্ত হয় না সুলতা। বৃদ্ধ শ্বশুরের কপালের উপর তার ঠাণ্ডা হাত এসে পড়ে। অবিনাশবাবুর উত্তাপ যেন আরো বেড়ে যায়। তিনি নিজেকে প্রাণপণে সংযত করেন। কমলেশ এতক্ষণে অনেকদূরে চলে গেছে না? কানপুর পেঁছিবে তো কাল সকালে।

—কাল সকালেই পেঁছিবেন! আপনি ভাববেন না বাবা। মনে মনে হাসে সুলতা। একমাত্র পুত্র দূরে গেছে, স্নেহপ্রবণ পিতা শান্তি পাচ্ছেন না দুর্ভাবনায়। পরম যত্নে সে অবিনাশবাবুর মাথায় হাত বোলাতে থাকে।

অবিনাশবাবু আর কিছু বলেন না। সুলতার মনে হয় অবিনাশবাবুর গাত্রতাপ স্বাভাবিকের চাইতে বেশি। ওঁর জ্বর হয়নি তো? উদ্বেগের মধ্যে তার আরো মনে হয় তার শ্বশুর তাকে নিজে পছন্দ করে ঘরের বৌ করে এনেছেন। আর বিপত্নীক শ্বশুরের নিঃসঙ্গ জীবনের সব কিছুই তো পূর্ণ হবার প্রতীক্ষা করছে তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়েই।

—আপনার গা তো গরম বাবা। উৎকণ্ঠিত সুলতা বলে। জ্বর হয়েছে বোধহয়। একটু থেমে আবার বলে, আপনার পা টিপে দেব বাবা?

ভালো লাগে অবিনাশবাবুর তাঁর জন্য সুলতার উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে।

—তুমি যাও মা, আমার কিছু হয়নি। কমলেশ চলে গেছে, আমার মনটা তত ভালো নেই। বৃদ্ধের গলা যেন ধরে আসে।

সুলতা কথা বলে না। মাথা নীচু করে একমনে অবিনাশবাবুর পা টিপতে থাকে।

জানালা দিয়ে রাস্তার আলো সুলতার মুখে এসে পড়েছে। মাথায় তার ঘোমটা নেই। সুশ্রী মুখের সুডৌল গঠনে কেমন যেন ভালো লাগা ভাব। অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর দেহের সেই জ্বালা জ্বালা ভাবটা যেন কমে এসেছে। গভীর স্নেহে অবিনাশবাবু ডাকেন, মা সুলতা!

—কি বাবা?

—কমলেশ বাইরে গেছে। তোমারও তো খুব খারাপ লাগছে।

কি জবাব দেবে সুলতা এ কথার! তার তিন মাসের বিবাহিত জীবনে আজই প্রথম তার স্বামী তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। খারাপ তো লাগবেই।

অবিনাশবাবুই আবার বলেন, কবে আসবে কমলেশ?

—চার-পাঁচ দিন পরে। সম্ভবত আসছে বুধবার সকালে আসবেন।

—এ ক'টা দিন তো তুমি তোমার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারো মা।

—না বাবা। আপনার কষ্ট হবে।

—না মা, আমার তো মাঝে মাঝে একা থাকা অভ্যাস আছে। তোমারই খারাপ লাগছে খুব। তা ছাড়া একলা ঘরে রাত্রে ভয়ও তো পেতে পারো।

রাত্রের কথায় সুলতার মনে পড়ে আজ পর্যন্ত একলা সে শোয়নি কোনদিন। বিয়ের পর কমলেশের সঙ্গে শুচ্ছে বটে, কিন্তু বিয়ের আগেও সে একা শুতে সাহস পায়নি কখনও। বরাবর সে বোনেদের সঙ্গে এক ঘরে শুয়েছে। তাই তো! আজ সে একলা ঘরে শোবে কি করে! ভয়ে যে তার ঘুমই আসবে না। চলে যাবে নাকি বাপের বাড়ি! কিন্তু অসুস্থ বুড়ো শ্বশুরকে একলা রেখে যেতে তার মন সায় দেয় না। একটু ইতস্তত করে সে বলে, আপনি তো এ ঘরে থাকবেন বাবা। মাঝের দরজাটা আজ খুলে রাখব। তাহলে আর ভয় লাগবে না।

সুলতা ঘর ছাড়ার একটু পরেই অবিনাশবাবু পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বন্ধু ঘোষালের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

রাত নিঃস্তব্ধ গভীর। বারোটার ঘর ছেড়ে ঘড়ির কাঁটা দ্রুত একটার ঘরের দিকে ছুটছে। সমস্ত বাড়িটা নিঝুম। একতলা, দোতলা, তিনতলার সমস্ত বাসিন্দা গভীর সুষুপ্তিমগ্ন। জেগে আছেন শুধু অবিনাশবাবু। তাঁর চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। মাথার মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছে। মনে হচ্ছে রগের শিরা দুটো ছিঁড়ে যাবে এক্ষুনি। উগ্র একটা উন্মাদনায় তাঁর দু'চোখে আগুনের দীপ্তি। খানিকক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়েন তিনি। জানালার ধারে দাঁড়ান। চোখ সারা দিনের অভ্যস্ত হিসাবে সামনের দোতলার জানালার দিকে। জানালার পর্দা টানা। পিছনে অনন্ত তমিস্রার জাল! ওরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে —নতুন বৌটি আর তার স্বামী।

মাথার মধ্যে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করে উঠল তাঁর। জানালা ছেড়ে সরে আসেন অবিনাশবাবু। ঘাড়ে মাথায় একটু জল দেওয়া দরকার। ঘুমের বড়ি খেতে হবে একটা নইলে হয়তো আজ আর ঘুম আসবে না।

দরজা খুলে বাইরে আসেন অবিনাশবাবু। পাশের ঘরেই সুলতা

ঘুমিয়ে। ঘরের পাশ দিয়েই বাথরুমে যাবার রাস্তা। চোখে পড়ল সুলতার ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাতে আলো জ্বালিয়ে সুলতা কি করছে? বিস্মিত হলেন অবিনাশবাবু। জানালার পর্দা একটু সরিয়ে ভিতরে উঁকি দেন। সুলতা ঘুমিয়ে আছে তার বিছানায়। হয়তো আলোটা নেভাতে ভুলে গেছে, কিংবা অন্ধকারে একা থাকতে সাহস পায়নি। আলো জ্বালিয়েই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। পর্দাটা আর একটু সরিয়ে তিনি ঘুমন্ত সুলতার দিকে তাকান।

পাশ ফিরে শুয়ে আছে সুলতা এদিকেই মুখ ফিরিয়ে। মাথাটা বালিশের ওপর একটু হেলে আছে। কাপড় উঠে পায়ের গোছ দেখা যাচ্ছে। কি হল অবিনাশবাবুর! তিনি তাঁর আর সুলতার ঘরের মাঝখানের ভেজানো দরজা খুলে একেবারে চলে এলেন ঘুমিয়ে থাকা সুলতার শয্যার পাশে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘুমন্ত সুলতা আর্ত চীৎকার করে ওঠে। একটা গোঙানির মধ্যে তার কোমল চোখের পাতা দুটি খুলে যায়। ভয়ার্ত সুলতার কাতর আওয়াজের মধ্যে এক মুহূর্তে অবিনাশবাবু অনেকদিন আগে হারিয়ে যাওয়া নন্দিনীকে খুঁজে পান। এক লহমায় মনে পড়ে তাঁর নন্দিনীও মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়ে চিৎকার করে তাঁকে জড়িয়ে ধরত। অদ্ভুত কোমল হয়ে আসে অবিনাশবাবুর চোখের ভাষা। অনাস্বাদিতপূর্ব মমতায় সুলতার কপালের উপর তাঁর ডানহাতখানা রাখেন।

—স্বপ্ন দেখেছ বুঝি মা! স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছ?

পরম নির্ভরতায় সুলতার চোখের পাতা বুজে আসে।—হ্যাঁ বাবা, একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল একটা কালো কদাকার জন্তু তার লকলকে জিভ বার করে আমার দিকে তেড়ে আসছে।

—ভয় নেই মা, তুমি ঘুমোও। বিশ্রী জন্তুটা আর আসবে না। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

—না বাবা, এতরাতে আর কষ্ট করবেন না। আপনি শুয়ে পড়ুন। সুলতা আপত্তি করে স্বাভাবিক জড়তায়।

—লজ্জা কি মা! আমার নন্দিনী যখন বেঁচে ছিল, সেও মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে ভয় পেত। ভয় পেলে আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতাম। বাৎসল্যে রুদ্ধ অবিনাশবাবুর গলা জড়িয়ে আসে।

আর আপত্তি করে না সুলতা। পরম স্বস্তিতে সে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অবিনাশবাবুর মনে হয় বহুদিন পরে তাঁর নন্দিনী আবার ফিরে এসেছে। আর তিনি গভীর স্নেহে তার মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। অনির্বচনীয় আনন্দময় প্রশান্তিতে অবিনাশবাবুর মন ভরে ওঠে।

---